প্রচলিত আছে। তাঁহার ধীশক্তি এমন প্রবল যে কথিত আছে সাত বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তিনি বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করিয়া চতুর্ম্মাসের মধ্যে চারি বেদ, ষড়দর্শন ও অষ্টাদশ পুরাণ কণ্ঠস্থ করেন। তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন পন্থা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্রই দেশ দেশান্তরে স্বমত প্রচারে বাহির হইলেন। ভক্তমালে লিখিত আছে, তিনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণ দেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন। তথা হইতে উজ্জয়িনী নগরে গমন করিয়া শিপ্রাতটে অশ্বথ বৃক্ষতলে অবস্থিতি করেন। তথায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অচলা ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া অতি মনোহর অপূর্ব্বরূপে দর্শন দিয়া তাঁহাকে বালগোপালের সেবা প্রচার করিতে আদেশ করিলেন। এই উদ্দেশে তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক অবশেষে কাশীবাসে জীবন উৎসর্গ করেন। কাশীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যুঘটনাবিষয়ক আখ্যান এই; তিনি মর্ত্তলীলা সম্পন্ন করিয়া এক দিবস হনুমান ঘাটে গঙ্গাসলিলে অবতীর্ণ হইলেন এবং অবগাহন করিতে করিতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহার অবগাহন স্থান হইতে এক দীপ্যমান অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং তিনি বহুতর দর্শক-সমক্ষে স্বর্গারোহণ করত আকাশে লীন হইয়া গেলেন।

বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্ম বিলাসের ধর্ম্ম—ঐশ্বর্য্যবান্ ও ভোগবান্ গৃহস্থেরা ঐ ধর্ম্মে অনুরক্ত। অন্যান্য পণ্ডিতেরা বলেন ধর্ম্মের পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কঠিন (দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি) বল্লভাচার্য্যনির্দ্দিষ্ট মার্গ সেরূপ নহে তাহাকে পুষ্টিমার্গ বলে। তিনি কহিয়া গিয়াছেন পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের আবশ্যকতা নাই—অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবারও প্রয়োজন নাই—বনবাস স্বীকার পুরঃসর কঠোর তপস্যাতেও ফলোদয় নাই। উত্তম বসন পরিধান ও সুখাদ্য অন্নভোজনাদি সমস্ত বিষয়সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক তাঁহার সেবা কর। উচ্চাঙ্গ বৈষ্ণব ধর্ম্মের মতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম রূপকচ্ছলে গৃহীত—তাহা পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার প্রেমের আদর্শ। বল্লভাচার্য্যের ধর্ম্মে এই প্রেম পার্থিব ধূলির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইহার আধ্যাত্মিক স্বর্গীয় ভাব লোপ পাইয়াছে।

এই বিলাস ধর্ম্ম হইতে নানা প্রকার অনীতি অত্যাচার প্রসূত হইয়াছে। গোঁসাইজী মহারাজ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবানের পার্থিব প্রতিনিধি; শিষ্যেরা তনমনধনে তাঁহার সেবায় রত থাকিবে এইরূপ বিধান আছে। এই সকল বৈষ্ণবমন্দিরে দেখিবে মহারাজই দেবতা—তিনিই পূজার পাত্র। তাঁহার পদধূলি সেবন ও চরণামৃত পান—তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ—তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন—আরতি রাসদোলা প্রভৃতি দেবারাধন উপকরণে তাঁহার অর্চ্চনা, এই সমস্ত অনুষ্ঠানে শিষ্যগণ আপনাদিগকে পুণ্যবন্ত কৃতকৃতার্থ মনে করেন। এ অপেক্ষাও সহস্রগুণে নিন্দনীয় জঘন্য পাপাচার যাহা উল্লেখ করিতেও হৃৎকম্প হয় তাহা এই যে বৈষ্ণব কুলবধূগণ মহারাজকে শ্রীকৃষ্ণ-

নির্ব্বিশেষ মানিয়া তাঁহার সেবায় আপন সতীত্ব পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সঙ্কুচিত হন না।

কতক বৎসর হইল গুজরাতের প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক মৃত করসন দাস মুলজী বোম্বাই সুপ্রীমকোর্টে মহারাজ লাইবেল মকদ্দমায় বল্লভাচারী বৈষ্ণবদিগের নীতিবিরুদ্ধ আচারগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া গুজরাত সমাজের বিস্তর উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন সেই অবধি মহারাজদিগের বিষম অত্যাচার কতকটা প্রশমিত দেখা যায়। *

স্বামী নারায়ণ } বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সকল অনীতিগর্ভ বিশ্বাস ও ব্যবহার-বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়া গুজরাতে স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। সহজানন্দ স্বামী এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। গুজরাতে তাঁহার প্রায় দুই লক্ষ অনুচর দৃষ্ট হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী আচার্য্যগণ বল্লভাচার্য্যদের দৃষ্টান্তে মহারাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছেন। সহজানন্দস্বামী রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন। † যে সময়ে রামমোহন রায় স্বদেশে আচার ব্যবহার ধর্ম্মাদি সংশোধন করিয়া উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর রোপন করিতে কৃতসংকল্প হন, সহজানন্দ স্বামীও তখন গুজরাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনীতি কলঙ্ক অপনোদন করিয়া বিশুদ্ধ নীতিমার্গ প্রদর্শন করিতে তৎপর থাকেন। সহজানন্দ অযোধ্যা প্রদেশের চপাই নামক গ্রামে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ ও ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রমে গুজরাতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া গুজরাতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার কি-এক সরল সাধুভাব ও আকর্ষণী শক্তি ছিল কতিপয় বৎসরের মধ্যেই অনুরক্ত শিষ্যদলে তিনি পরিবেষ্টিত হইলেন। ‡ তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়াতে আহমদাবাদের ব্রাহ্মণ ও কর্ত্তৃপক্ষদের ঈর্ষ্যানল উদ্দীপ্ত হইল। তিনি অত্যাচার ভয়ে পলায়ন পূর্ব্বক আহমদাবাদের ৬ ক্রোশ দক্ষিণে জয়তলপুর গ্রামে আসিয়া অধিষ্ঠান করেন ও তথায় এক মহা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। এইরূপ সমাগমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদের মধ্যে গোলযোগ আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তৃপুরুষেরা স্বামীকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করেন। কিন্তু তাহার ফল উল্টা হইল। লোকের হৃদয় তাঁহার প্রতি সমধিক আকৃষ্ট ও তাঁহার আধিপত্য শতগুণ বৃদ্ধি হইল। শীঘ্রই তিনি কারামুক্ত হইলেন ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহার চতুর্দ্দিকে আসিয়া জুটিল। অনন্তর বর্ত্তাল নামক এক বিজন পল্লীতে তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইয়া তথায় লক্ষ্মীনারায়ণের

---

* অল্প দিন হইল ব্রজেশজী নামক একজন মহারাজ জেলে গিয়া তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে হুলুস্থুল বাধাইয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

† রামমোহন রায়ের জন্ম ১৭৭৪ মৃত্যু ১৮৩৩।

‡ বিশপ হীবরের গ্রন্থে এই খৃষ্টীয় ও হিন্দু আচার্য্যের সাক্ষাৎকার সংঘটন বর্ণিত হইয়াছে।

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তথা হইতে ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এক্ষণে বর্ত্তালগ্রামে স্বামী-নারায়ণ সম্প্রদায়ীদের দুইটি মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বামপার্শ্বে স্বামী নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেখ কত অল্পকাল মধ্যে কেমন সহজে সহজানন্দস্বামী হিন্দু দেবমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ লাভ করিলেন। ভারতবর্ষে নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি প্রকরণ স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইতে সুস্পষ্ট নিরীক্ষণ করা যায়। এই সম্প্রদায়ীদের দুই শ্রেণী—সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত, গেরুয়া বসনধারী, সন্যাস ধর্ম্মানুরক্ত, প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত। তাহাদের সংখ্যা প্রায় ১০০০। তাহাদের যত্ন ও উৎসাহে চাসা কুলি প্রভৃতি নীচজাতি মধ্যে এই ধর্ম্মের প্রচার হইয়া মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। স্বামীনারায়ণ ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম শিক্ষাপত্রী। এই গ্রন্থ সহজানন্দস্বামী কর্ত্তৃক সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় বিরচিত।

বিঠ্‌ঠল ভক্ত — মহারাষ্ট্র প্রদেশে বিঠ্‌ঠল ভক্ত নামে একটী সম্প্রদায় আছে। গুজরাত কর্ণাটে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের উপাস্য দেবতার নাম বিঠ্‌ঠল ও বিঠোবা। ইহারা তাঁহাকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করে। দক্ষিণাপথে ভীমা নদীর দক্ষিণ তীরে পণ্ডরপুরে ঐ বিঠ্‌ঠল দেবের একটি মন্দির আছে। পণ্ডরপুর মহারাষ্ট্র দেশের এক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। আষাঢ়ী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় অসংখ্য অসংখ্য যাত্রী বিঠোবা দর্শনে সমাগত হয়। এই স্থানে পুরাকালে হয়ত বৌদ্ধদের ধর্ম্মক্ষেত্র ছিল। কথিত আছে যে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তির স্থান এক্ষণে বিঠোবাদেব অধিকার করিয়া সকল জাতির পূজার পাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই সম্প্রদায়ীগণ জাতিভেদ স্বীকার করেন না—মহোৎসবের সময় জগন্নাথক্ষেত্রের ন্যায় পণ্ডরপুরস্থিত দেবমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিঠ্‌ঠল ভক্তেরা পরস্পর পরস্পরের অন্ন গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ইহাদিগকে বৌদ্ধবৈষ্ণব বলিয়া উল্লেখ করিলে অসঙ্গত হয় না।

তুকারাম — সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারামের কবিতাবলি বিঠোবার স্তুতি গীতে পূর্ণ। তুকারাম ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে পুণার সন্নিকটস্থ দেহগ্রামে বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন। শিবাজীর রাজত্ব কালে তিনি প্রাদুর্ভূত হন ও প্রায় ৫০০০ গাথা রচনা করেন। এই সকল গাথা সুনীতি ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ও মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্বসাধারণে সমাদৃত। দু একটী দৃষ্টান্ত দিলেই হইবে।

> ১ ভক্তি ভরে গান কর, শুদ্ধ কর মন,
> হরি যদি পেতে চাও এই সে সাধন।
> নম্র হও, থাক সদা সাধু পদচ্ছায়,
> কান পাতিও না কভু পর-চরচায়।

তুকা বলে—কর ভাই পর উপকার,
অল্প হোক্, বেশী হোক্, যা সাধ্য তোমার।

২ হে ঈশ্বর, এই কর তোমারে না ভুলি,
তব গুণগান যেন করি প্রাণ খুলি।
আর কিছু নাহি চাই, এই এক আশ,
ধন সম্পদের তরে না রাখি প্রয়াস।
নির্ব্বাণ করিতে লাভ বাসনা যে নাই,
দুর্লভ জনম হ'তে মুক্তি নাহি চাই।
বেঁচে থেকে করি শুধু তব গুণগান,
সাধুসঙ্গ ভোগ করি এই চাহে প্রাণ। *

পাঠশালা।

হরিশপুরের বোসেদের বাড়ী চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসিয়াছে। সকালবেলা, এখনও সূর্য্য উঠে নাই। পাততাড়ি কাঁকে ছেলের দল প্রভাতের মৃদু শীতল বায়ু সেবন করিতে করিতে ক্রমে আসিয়া জুঠিতেছে। বাঁ হাতে দোয়াত ঝুলিতেছে, আর ডাইন হাতের ত অবসরই নাই। তিনি চালাকদাস ঘটক চূড়ামণির মত দণ্ডে দণ্ডে মুড়ি মুড়কিভরা কোঁচড় আর আহ্লাদ ভরা মুখের মধ্যে আনাগোনা করিতে ছিলেন। দুই একটা কাক ফলারে বামুনের মত প্রভাতের কোলাহল কচকচি ছাড়িয়া ছেলেদের সঙ্গ লইল। পল্লিগ্রামের মানুষ তেমন সেয়না নয়। কিন্তু সে গুণের জন্য পাড়াগেঁয়ে কাকেদের সুখ্যাতি কেহ করে না। সহরে মানুষ গুলোর মধ্যেও তেমন Practical জীব ত আমি কাউকে দেখিনে। প্রমাণ হাতে হাতে। মাথার উপর কা কা শব্দ শুনিয়া যাই ছেলেরা উর্দ্ধে চাহিতেছে, অমনি কোঁচড়ের জলপান কিছু কিছু করিয়া পড়িয়া যাইতেছে। অতএব কাক মহাশয়ের কল কৌশল নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই।

---

* হিন্দু ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিবরণ লিখিবার সময় শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয় কুমার দত্তের উপাসক-সম্প্রদায় পুস্তকের পাত উল্টাইয়াছি ও তাহার যথোচিত ব্যবহার করিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। ঐ পুস্তক ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় বিষয়ক বিজ্ঞানের খনি বলিলেও হয়। উহাতে কিন্তু স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই—তদ্বিবরণ অধ্যাপক Monier Williams কৃত Religious life and thought in India নামক গ্রন্থ হইতে সংকলিত হইল। অন্যান্য জাতির বিবরণ Bombay Gazetteer ও অন্যত্র হইতে সংগৃহীত।

গুরুমহাশয় রামধন ভট্টাচার্য্য একটা ছেঁড়া বড় মাদুর পাতিয়া চণ্ডীমণ্ডপের এক ধারে বেত হাতে বসিয়া আছেন। ছেলেরা আসিতেছে, আর প্রথমে গুরুমহাশয়ের কাছে হাতছড়ি খাইয়া পাততাড়ির ঢাকা খুলিয়া ছোট ছোট মাদুরগুলি সারি সারি বিছাইয়া বসিতেছে—কেহ বা বেহাত হইয়া মুড়ি মুড়কি ছড়াইয়া ফেলিতেছে। গুরুমহাশয়ের চেহারাখানা বড় জমকাল। আজ-কাল ভাল মানুষের চেহারার কথা লিখিতে হইলে গৌরবর্ণ না বলিলে লোকের ভাল লাগে না—কিন্তু গরিব গুরুমহাশয়ের তামাটে রং আর মাথায় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী টাক—চুলের সম্পর্কমাত্র নাই। তা ভাল না লাগিলে কি করিব? দেহের মধ্যে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন—তাঁর মার্জ্জিত পৈতাগাছটা। ছেলেরা কানাকানি করে, রোজ মহাশয় একটা বেলের আঠা উহাতে লাগাইয়া থাকেন।

গুরুমহাশয়ের চেহারায় ছেলেদের প্রধান লক্ষ্য তাঁহার চোক দুটী—গোল গোল লাল চক্ষু! লোকে বলিত, তিনি নাকি গঞ্জিকা সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, বেত হাতে গুরুমহাশয় সেই জবা চক্ষু যার উপর স্থাপিত করেন, কিছুতে তার আর নিস্তার নাই। বোসেদের কুমুদ, বয়স তার সবে পাঁচ বছর; সে বড় খুসী হইয়া হাতছড়ি লইতে গেল। গুরুমহাশয়ের অন্যমনস্ক চক্ষুর পূর্ণ জ্যোতি তাহার উপর পড়িল—সে ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

তখন গুরুমহাশয় তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিলেন—"আচ্ছা! বল্ ত হাতছড়ি নিবি না শন্নি নিবি!"

কুমুদ বাম হস্তে চক্ষু মুছিতে মুছিতে কান্নার সুরে বলিল—"শন্নি নেব!"

অমনি শ্যামা, রামা, শঙ্করা, ভূজো—কুমুদের সমবয়সীর দল—জলপান ও লেখা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া সমস্বরে আপত্তি করিল—

"কেন গুরুমহাশয়, আমরা এলুম আগে, আর কুমো এলো পরে, ওর শন্নি হবে কেন?"

গুরুমহাশয় নিমেষের জন্য বিহ্বল হইলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা কতক্ষণের জন্য? তিনি লাল চক্ষু আরও লাল করিয়া আপত্তিকারীদিগকে এককালে "শন্নি" ও "হাতছড়ির" গুরুতর প্রভেদ অনুভূত করাইলেন। বুঝা গেল "শন্নি" দারুণ গুঁতোয় এবং "হাতছড়ি" তীব্র বেত্রাঘাতে পরিণত হইতে পারে। পাঠশালাময় চ্যাঁভ্যাঁ পড়িয়া গেল। সর্দ্দার পোড়রা পর্য্যন্ত সশঙ্কিত হইয়া উঠিল।—কেন না গুরুমহাশয় বড়ই রাগিয়া উঠিয়া প্রহারলোলুপ দীর্ঘ বেত্রখণ্ড চণ্ডীমণ্ডপতলে জোরে জোরে আস্ফালিত করিতে ছিলেন।

ঝড় থামিয়া যায়, আগুন নিভিয়া যায়, তা গুরুমহাশয়ের রাগ কতক্ষণ? সর্দ্দার পোড়ো নিধিরাম এতক্ষণ হাঁকিয়া হাঁকিয়া "মহামহিম" লিখিতেছিল এবং বোসেদের বড় বাবুর নাম কাঁদিয়া কর্জ্জ করিবার কায়দাটা শিখিতেছিল। যেমন সে বুঝিল, মশায়ের রাগ একটু কমিয়াছে, অমনি কাছে আসিয়া তামাকু সাজিতে চাহিল। রামধন ভট্টাচার্য্যের

মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন "ভাল তামাক সেজে আনিস্ রে ব্যাটা! তোর বাপের তামাক একটু চুরি করেই না হয় আন! আর দেখিস্ যেন খেয়ে পুড়িয়ে শেষ করে আনিস নে!"

নিধিরাম ছুই লাফে পাঠশালা ত্যাগ করিল। তখন গুরুমহাশয় প্রসন্ন চিত্তে ছেলেদের দিকে চাহিলেন। হুঁকাটী হাতে করিয়া বলিলেন,

"হুঁকোর জল পুরিতে যাবি কেরে?"

"আমি যাব মশায়," "আমি যাব মশায়" রব চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ১০।১২ জন উমেদার আপনাদের স্থান ছাড়িয়া গুরুমহাশয়ের সমুখে হাজির হইল। এবং পরস্পর পরস্পরের হুঁকোর জল পুরার অসামর্থ্য প্রমাণ করিবার জন্য বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিল। গুরুমহাশয় সেকরাদের ভোলাকেই যথোপযুক্ত পাত্র স্থির করিলেন, কেন না সে জল সমান করিয়া আনিতে পারে।

মধো বলিল, "ও হুঁকো এঁটো করে মশায়, তাই জল সমান হয়!"

তারিণী বলিল "ও হুঁকোয় মুখ দিয়ে সূর্য্যির দিকে জল ছিটোয়, আর রামধনুক দেখে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি মশায়!"

গুরুমহাশয় আবার বেত্রাস্ফালন করিলেন। মধো এবং তারিণীপ্রমুখ ক্ষুব্ধ উমেদারগণ পিঠ বাঁচাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আপন আপন স্থানে গিয়া বসিল। তখন ভোলা একাকী দাঁড়াইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে বেত্রাঘাতের ভরসায় কাঁপিতেছিল। কিন্তু আজ্ অদৃষ্ট ভাল—হুঁকো উচ্ছিষ্ট করিতে নিষেধ মাত্র করিয়াই গুরুমহাশয় তাহাকে নির্দ্দিষ্ট কাজে বিদায় দিলেন।

বেলা এক প্রহর হইলে জলখাবারের ছুটী হইল। আজ্ যার যার সিধা দিবার পালা, গুরুমহাশয় তাহাদিগকে বিশেষ করিয়া ফরমাইশ করিলেন, কি কি জিনিস আনিতে হইবে। চাল, দাল, তরকারী, তেল, নুনের ত কথাই নাই। আর সব ছেলেকে যে রোজই ৮ খান করিয়া ঘুঁটে আনিতে হইবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা, তা ছাড়া যার বাড়ীতে ভাল জিনিস যাহা কিছু সম্প্রতি আসিয়াছে, তাহাও আনিতে হুকুম হইল। বাড়ীর লোকে সহজে না দিলে চুরি করার ব্যবস্থাও দেওয়া হইল। আর আদেশ হইল সর্দ্দার পোড়োদের কাহাকেও কলার পাত কাটিয়া আনিতে হইবে, কাহাকেও বা গুরুমহাশয়ের জল আনিয়া পাকের ঘর পরিষ্কার করিতে হইবে।

পাঠশালার নিকট দিয়া বাগদী বুড়ী লাঠি ঠক্‌ঠক্ করিয়া যাইতেছিল। ছুটীপ্রাপ্ত ছেলের দল দেখিয়া তার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! বুড়ি ভাবিল ছেলেগুলো যদি এক সারি পিপীলিকা হইত, তবে অনায়াসে সে শত্রুকুল পদতলে দলিত করিতে পারিত। কিন্তু কেমন নিষ্ঠুর বিধির বিধান, বুড়ীকে দেখিয়া আনন্দে ছেলের দল করতালি দিল, তার উদ্দেশ্যে গাহিল,—

বাগ্‌দী বুড়ী গুড়ি গুড়ি—
দাঁত নেই খায় তালের খুড়ি!

বুড়ী প্রথমে সে গান যেন শুনে নাই, এমনি ভান করিয়া গন্তব্য পথে চলিল। কিন্তু সে রাগিয়া গালি না দিলে শিশুদের আমোদ সম্পূর্ণ হয় না।—স্থবুদ্ধি মধো পিছন দিক হইতে আসিয়া বুড়ির মাথায় ধুলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিল। তখন বুড়ী শিশুর দলকে তাড়া করিল এবং তাহাদের পিতৃ মাতৃ উদ্দেশে অভিধান বহির্ভূত অনেক সুকথা কীর্ত্তিত করিয়া আপনার পথে চলিয়া গেল। এই রূপে ছেলেদের প্রাতঃকালীন বিদ্যালাভ সম্পূর্ণ হইল।

মধ্যাহ্নে স্নানাহার করিয়া রামধন ভট্টাচার্য্য আবার পাঠশালায় আসিয়া বসিলেন—এবার একটা উপাধান সঙ্গে আনিলেন। গুরুমহাশয় বসিয়া হেলান দিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে আরামে তামাকু সেবন করিতেছিলেন, এমন সময়ে সর্দ্দারপোড়ো নিধিরাম আসিয়া বলিল যে, ভোলা আর মধো একজোট হইয়া তালপুকুরের বটগাছে কোকিলের ছানা পাড়িতে গিয়াছে। অমনি নিধে, তারিণী আর দুখীরামের উপর আদেশ হইল, গুরুমশায় করিতে করিতে ছোঁড়া দুটোকে ধরিয়া লইয়া আসুক। সর্দ্দার পোড়ো তিন জনের সঙ্গে পাঠশালার সকল ছেলে ভাঙ্গিয়া চলিল। সেই চৈত্র মাসের দুপুর রোদে আঁব বাগানে ছুটাছুটী করিয়া আঁব পাড়িবার লোভ সকলেরই মনে জাগিতেছিল, অতএব ছেলেমহলে ভারি আনন্দ পড়িয়া গেল। এদিকে শ্রীল শ্রীযুক্ত রামধন ভট্টাচার্য্য গুরুমহাশয় নিশ্চিন্ত হইয়া নাসিকা গর্জ্জন করিতে করিতে সেই গোল গোল জবাফুলের চোক্ দুটি মুদ্রিত করিলেন।

ততক্ষণ তাল পুকুরের তালবনের ঘন শীতল ছায়ায় বসিয়া সেকরাদের ভোলা সভয়ে চারিদিকে চাহিতেছিল, আর স্থবুদ্ধি মধো নিকটেই প্রকাণ্ড বটগাছে উঠিয়া ভাবিতেছিল, কোন ডাল দিয়া গেলে কাকগুলো তাহাকে দেখিতে পাবে না।

বাঙ্গলা উচ্চারণ।

ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজি শব্দের উচ্চারণ মুখস্থ করিতে গিয়াই বাঙ্গালীর ছেলের প্রাণ বাহির হইয়া যায়। প্রথমত ইংরাজি অক্ষরের নাম এক রকম, তাহার কাজ আর-এক রকম। অক্ষর দুটি যখন আলাদা হইয়া থাকে তখন তাহারা এ, বি, কিন্তু একত্র হইলেই তাহারা অ্যাব্‌ হইয়া যাইবে, ইহা কিছুতেই নিবারণ করা যায় না। এদিকে u কে মুখে বলিব ইউ, কিন্তু up-এর মুখে যখন থাকেন তখন তিনি কোন পুরুষে ইউ নন্। "ও পিসি এদিকে এসো"—এই শব্দগুলো ইংরাজিতে লিখিতে হইলে

উচিতমত লেখা উচিত—O pe adk so। পিসি যদি বলেন "এসেচি"—তবে লেখ She—আর পিসি যদি বলেন "এইচি" তবে আরও সংক্ষেপ he। কিন্তু কোন ইংরাজের পিসির সাধ্য নাই এরূপ বানান বুঝিয়া উঠে। আমাদের কখগঘ-র কোন বালাই নাই—তাহাদের কথার নড়চড় হয় না।

এই ত গেল প্রথম নম্বর। তার পরে আবার এক অক্ষরের পাঁচ রকম উচ্চারণ। অনেক কষ্টে যখন বি, এ=বে, সি, এ=কে মুখস্থ হইয়াছে—তখন শুনাগেল বি, এ, বি=ব্যাব, সি, এ, বি=ক্যাব্। তাও যখন মুখস্থ হইল তখন শুনি, সি, এ, আর=বার, সি, এ, আর=কার। তাও যদি বা আয়ত্ত হইল তখন শুনি, বি, এ, ডবল্ এল=বল; সি, এ, ডবল্ এল=কল্। এই অকূল বানান পাথারের মধ্যে গুরু মহাশয় যে আমাদের কর্ণ ধরিয়া চালনা করেন তাঁহার কম্পাসই বা কোথায় তাঁহার ধ্রুবতারাই বা কোথায়!

আবার এক এক জায়গায় অক্ষর আছে অথচ তাহার উচ্চারণ নাই—একটা কেন এমন পাঁচটা অক্ষর সারি সারি বেকার দাঁড়াইয়া আছে—বাঙ্গালীর ছেলের মাথার পীড়া ও অম্লরোগ জন্মাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহাদের আর কোন সাধু উদ্দেশ্যই দেখা যায় না। মাষ্টার মশায় psalm শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলে কিরূপ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত তাহা আজও কি ভুলিতে পারিয়াছি! পেয়ারার মধ্যে যেমন অনেকগুলো বীজ কেবল মাত্র খাদকের পেটকামড়ানীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিরাজ করে—তেমনি ইংরাজি শব্দের উদর পরিপূর্ণ করিয়া অনেকগুলি অক্ষর কেবল রোগের বীজ স্বরূপে থাকে মাত্র। বাঙ্গলায় এ উপদ্রব নাই। কেবল একটি মাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙ্গীন্ ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—"গবর্ণমেণ্ট" শব্দের মূর্দ্ধন্য ণ! ওটা বিদেশের আমদানী নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভাল।

ইংরাজের কামান আছে বন্দুক আছে কিন্তু ছাব্বিশটা অক্ষরই কি কম! ইহারা আমাদের ছেলেদের পাকযন্ত্রের মধ্যে গিয়া আক্রমণ করিতেছে। ইংরাজের প্রজা বশীভূত করিবার এমন উপায় অতি অল্পই আছে। বাল্যকাল হইতেই একে একে আমাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হয়; আমাদের বাহুর বল, চোখের দৃষ্টি, উদরের পরিপাকশক্তি বিদায় গ্রহণ করে, তার পরে ম্যালেরিয়া কম্পিত হাত হইতে অস্ত্র ছিনাইয়া লওয়াই বাহুল্য। আইন ইংরাজ রাজ্যের সর্ব্বত্র আছে (রক্ষা হউক্ আর নাই হউক্) কিন্তু ইংরাজের ফার্ষ্ট্ বুকে নাই। যখন বর্গির উপদ্রব ছিল তখন বর্গির ভয় দেখাইয়া ছেলেদের ঘুম পাড়াইত—কিন্তু ছেলেদের পক্ষে বর্গির অপেক্ষা ইংরাজী ছাব্বিশটা অক্ষর যে বেশী ভয়ানক সে বিষয়ে কাহারও দ্বিমত হইতে পারে না। ঘুমপাড়ানী গান নিম্নলিখিত মতে বদল করিলে সঙ্গত হয়—ইহাতে আজকালকার বাঙ্গালীর ছেলেও ঘুমাইবে, বর্গির ছেলেও ঘুমাইবে:—

ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
কাষ্টবুক্ এল দেশে—
বানান্ ভুলে মাথা খেয়েছে
একজামিন্ দেবো কিসে!

পূর্ব্বে আমার বিশ্বাস ছিল আমাদের বাঙ্গালা অক্ষর উচ্চারণে কোন গোলযোগ নাই। কেবল তিনটে স, দুটো ন ও দুটো জ, শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। এই তিনটে সয়ের হাত এড়াইবার জন্যই পরীক্ষার পূর্ব্বে পণ্ডিত মশায় ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে "দেখ বাপু, 'সুশীতল সমীরণ' লিখ্‌তে যদি ভাবনা উপস্থিত হয় ত লিখে দিও 'ঠাণ্ডা হাওয়া'।" এ ছাড়া দুটো বয়ের মধ্যে এক্‌টা ব কোন কাজে লাগে না। ঋ, ৯, ঙ, ঞ গুলো কেবল সং সাজিয়া আছে, চেহারা দেখিলে হাসি আসে, কিন্তু মুখস্থ করিবার সময় শিশুদের বিপরীত ভাবোদয় হয়। সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় দীর্ঘ হ্রস্বস্বর। কিন্তু বর্ণমালার মধ্যে যতই গোলযোগ থাক্‌না কেন আমাদের উচ্চারণের মধ্যে কোন অনিয়ম নাই এইরূপ আমার ধারণা ছিল।

ইংলণ্ডে থাকিতে আমার একজন ইংরাজ বন্ধুকে বাঙ্গলা পড়াইবার সময় আমার চৈতন্য হইল, এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সমূলক নয়।

এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাঙ্গলা দেশের নানাস্থানে নানাপ্রকার উচ্চারণের ভঙ্গী আছে। কলিকাতা অঞ্চলের উচ্চারণ-কেই আদর্শ ধরিয়া লইতে হইবে। কারণ, কলিকাতা রাজধানী। কলিকাতা সমস্ত বঙ্গভূমির সংক্ষিপ্তসার।

"হরি" শব্দে আমরা "হ" যেরূপ উচ্চারণ করি "হয়" শব্দে "হ" সেরূপ উচ্চারণ করি না। "দেখা" শব্দের একার একরূপ, এবং "দেখি" শব্দের একার আর একরূপ। "পবন" শব্দে "প" অকারান্ত, "ব" ওকারান্ত, "ন" হসন্ত শব্দ। "শ্বাস" শব্দের "শ্ব"র উচ্চারণ বিশুদ্ধ "শ"য়ের মত, কিন্তু "বিশ্বাস" শব্দের "শ্ব"য়ের উচ্চারণ "শ্‌শ"য়ের ন্যায়। "ব্যয়" লিখি কিন্তু পড়ি "ব্যায়।" অথচ "অব্যয়" শব্দে "ব্য"য়ের উচ্চারণ "ব্ব"য়ের মত। আমরা লিখি "গর্দ্দভ," পড়ি "গর্দ্দোব্।" লিখি "সহ্য" পড়ি সোজ্‌ঝো।" এমন কত লিখিব!

আমরা বলি আমাদের তিনটে "স"য়ের উচ্চারণের কোন তফাৎ নাই; বাঙ্গালায় সকল "স"ই তালব্য "শ"য়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়—কিন্তু আমাদের যুক্ত অক্ষর উচ্চারণে এ কথা খাটে না। তার সাক্ষ্য দেখ "কষ্ট" শব্দ এবং "ব্যস্ত" শব্দের দুই সয়ের উচ্চারণের প্রভেদ আছে। প্রথমটি তালব্য শ দ্বিতীয়টি দন্ত্য স। "আস্‌তে হবে" এবং "আশ্চর্য্য" এই উভয় পদে দন্ত্য স ও তালব্য শয়ের প্রভেদ রাখা হইয়াছে। "জ"য়ের উচ্চারণ কোথাও বা ইংরাজি zএর মত হয়—যেমন "লুচি ভাজ্‌তে হবে" এস্থলে "ভাজ্‌তে" শব্দের "জ" ইংরাজি "z"-এর মত।

সচরাচর আমাদের ভাষায় অন্তাস্থ বয়ের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু "জিহ্বা" অথবা "আহ্বান" শব্দে অন্ত্যস্থ ব ব্যবহৃত হয়।

আমরা লিখি "তাঁহারা" কিন্তু উচ্চারণ করি "তাহাঁরা" অথবা "তাহাঁয়া"। এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ উচ্চারণের বিশৃঙ্খলা যখন নজরে পড়িল, তখন আমার জানিতে কৌতূহল হইল এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটা নিয়ম আছে কি না। আমার কাছে তখন খানদুই বাঙ্গলা অভিধান ছিল। মনোযোগ দিয়া তাহা হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। যখন আমার খাতায় অনেকগুলি উদাহরণ সঞ্চিত হইল তখন তাহা হইতে একটা নিয়ম বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এই সকল উদাহরণ এবং তাহার টীকায় রাশি রাশি কাগজ পূরিয়া গিয়াছিল। যখন দেশে আসিলাম তখন এই কাগজগুলি আমার সঙ্গে ছিল। একটি চামড়ার বাক্সে সেগুলি রাখিয়া আমি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত ছিলাম। দুই বৎসর হইল, এক দিন সকাল বেলায় ধুলা ঝাড়িয়া বাক্সটি খুলিলাম, ভিতরে চাহিয়া দেখি—গোটাদশেক হলুদে রং-করা মস্ত খোঁপাবিশিষ্ট মাটির পুঁতুল তাহাদের হস্তদ্বয়ের অসম্পূর্ণতা ও পদদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব লইয়া অম্লান বদনে আমার বাক্সর মধ্যে অন্তঃপুর রচনা করিয়া বসিয়া আছে। আমার কাগজ পত্র কোথায়? কোথাও নাই। একটি বালিকা আমার হিজিবিজি কাগজগুলি বিষম ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিয়া বাক্সটির মধ্যে পরম সমাদরে তাহার পুঁতুলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের বিছানাপত্র, তাহাদের কাপড় চোপড়, তাহাদের ঘটিবাটি, তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সামান্যতম উপকরণটুকু পর্য্যন্ত কিছুরই ত্রুটি দেখিলাম না কেবল আমার কাগজগুলিই নাই। বুড়ার খেলা বুড়ার পুঁতুলের জায়গা ছেলের খেলা ছেলের পুঁতুল অধিকার করিয়া বসিল। প্রত্যেক বৈয়াকরণিকের ঘরে এমনি একটি করিয়া মেয়ে থাকে যদি, পৃথিবী হইতে সে যদি তদ্ধিৎ প্রত্যয় ঘুচাইয়া তাহার স্থানে এইরূপ ঘোরতর পৌত্তলিকতা প্রচার করিতে পারে তবে শিশুদের পক্ষে পৃথিবী অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

কিছু কিছু মনে আছে তাহাই লিখিতেছি। অ কিম্বা অকারান্ত বর্ণ, উচ্চারণকালে মাঝে মাঝে ও কিম্বা ওকারান্ত হইয়া যায়। যেমন—

অতি, কলু, ঘড়ি, কলা, মরু, দক্ষ ইত্যাদি। এইরূপ স্থানে "অ" যে "ও" হইয়া যায়, তাহাকে হ্রস্ব "ও" বলিলেও হয়।

দেখা গিয়াছে অ কেবল স্থানবিশেষেই ও হইয়া যায়, সুতরাং ইহার একটা নিয়ম পাওয়া যায়।

১ ম নিয়ম। ই, (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) অথবা উ, (হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ) কিম্বা ইকারান্ত উকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ ও হইবে। যথা অগ্নি, অগ্রিম, কপি, তরু, অঙ্গুলি, অধুনা, হনু ইত্যাদি।

২য়। য ফলাবিশিষ্ট ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে "অ" "ও" হইয়া যাইবে। এ নিয়ম প্রথম নিয়মের অন্তর্গত বলিলেও হয় কারণ য ফলা "ই" এবং অয়ের যোগ মাত্র। উদাহরণ—গণ্য, দস্ত্য, লভ্য; ইত্যাদি। "দন্ত" এবং "দন্ত্য ন" এই দুই শব্দের উচ্চারণের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া দেখ।

৩য়। ক্ষ পরে থাকিলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী "অ" "ও" হইয়া যায়। যথা—অক্ষর, কক্ষ, পক্ষ, লক্ষ ইত্যাদি। ক্ষ শব্দের উচ্চারণ বোধ করি এককালে কতকটা ইকার-ঘেঁষা ছিল, তাই এই অক্ষরের নাম হইয়াছে ক্ষিয়। পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা এই "ক্ষ"র সঙ্গে য ফলা যোগ করিয়া উচ্চারণ করেন এমন কি "ক্ষ"র পূর্ব্বেও ঈষৎ ইকারের আভাস দেন। কলিকাতা অঞ্চলে "লক্ষ টাকা" বলে, তাঁহারা বলেন "লৈক্ষ্য টাকা।"

৪র্থ। ক্রিয়াপদে স্থলবিশেষে অকারের উচ্চারণ "ও" হইয়া যায়। যেমন, হ'লে, ক'রলে, প'ল, ম'ল, ইত্যাদি অর্থাৎ যদি কোন স্থলে অ-য়ের পরবর্ত্তী ই অপভ্রংশে লোপ হইয়া থাকে তথাপিও পূর্ব্ববর্ত্তী অয়ের উচ্চারণ "ও" হইবে। "হইলে"-র অপভ্রংশ "হ'লে;" "করিলে"-র অপভ্রংশ "ক'র্লে;" "পড়িল" "প'ল;" "মরিল" "ম'ল"। "করিয়া"র অপভ্রংশ "ক'রে" এই জন্য "ক"য়ে ওকার যোগ হয়—কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া "করে" অবিকৃত থাকে। কারণ "করে" শব্দের মধ্যে "ই" নাই এবং ছিল না।

৫ম। ঋফলা বিশিষ্ট বর্ণ পরে আসিলে তৎপূর্ব্বের অকার "ও" হয়। যথা, কর্ত্তৃক, ভর্ত্তৃ, মসৃণ, যকৃত, বক্তৃতা ইত্যাদি। ইহার কারণ স্পষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে, বঙ্গভাষায় ঋ ফলার উচ্চারণের সহিত ইকারের যোগ আছে।

৬ষ্ঠ। এবারে যে নিয়মের উল্লেখ করিতেছি তাহা নিয়ম কি নিয়মের ব্যতিক্রম বুঝা যায় না। দ্ব্যক্ষর বিশিষ্ট শব্দে দন্ত্য ন অথবা মূর্দ্ধণ্য ণ পরে থাকিলে, পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও হইয়া যায়। যথা, বন, ধন, জন, মন, মণ, পণ, ক্ষণ। ঘন শব্দের উচ্চারণের স্থিরতা নাই। কেহ বলেন—ঘনো দুধ, কেহ বলেন ঘোনো দুধ। কেবল গণ, এবং রণ শব্দ এই নিয়মের মধ্যে পড়ে না। তিন অথবা তাহার বেশী অক্ষরের শব্দে এই নিয়ম খাটে না। যেমন কনক, গণক, সন্‌সন্, কন্‌কন্। তিন অক্ষরের অপভ্রংশে যেখানে দুই অক্ষর হইয়াছে সেখানেও এ নিয়ম খাটে না যেমন, "কহেন" শব্দের অপভ্রংশ "ক'ন," "হয়েন" শব্দের অপভ্রংশ "হ'ন" ইত্যাদি। যাহা হউক্ ষষ্ঠ নিয়মটা তেমন পাকা নহে।

৭ম। ৪র্থ নিয়মে বলিয়াছি অপভ্রংশে ইকারের লোপ হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী "অ" "ও" হইয়াছে, অপভ্রংশে উকারের লোপ হইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী অ উচ্চারণস্থলে ও হইবে। যথা— "হউন" "হ'ন।" "রহুন" = "র'ন।" "কহুন" = "ক'ন।" ইত্যাদি।

৮ম। রফলা বিশিষ্ট বর্ণের সহিত অ লিপ্ত থাকিলে তাহা ও হইয়া যায়। যথা, শ্রবণ, ভ্রম, ভ্রমণ, ব্রজ, গ্রহ, ত্রস্ত, প্রমাণ, প্রতাপ। ইত্যাদি। কিন্তু য পরে থাকিলে "অ"য়ের বিকার হয় না। যথা ক্রয়, ত্রয়, শ্রয়।

ছয়েকটি ছাড়া যতগুলি নিয়ম উপরে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে বুঝাইতেছে ই কিম্বা উয়ের পূর্ব্বে "অ"য়ের উচ্চারণ ও হইয়া যায়। এমন কি ইকার উকার অপভ্রংশে লোপ পাইলেও এ নিয়ম খাটে। এমন কি, যফলা ও ক্ষফলায় ইকারের সংস্রব আছে বলিয়া তাহার পূর্ব্বেও "অ"য়ের বিকার হয়। ইকারের পক্ষে যেমন য ফলা, উকারের পক্ষে তেমনি ব ফলা—উয়ে অয়ে মিলিয়া ব ফলা হয়; অতএব আমাদের নিয়মানুসারে ব ফলার পূর্ব্বেও অকারের বিকার হওয়া উচিত। কিন্তু ব ফলার উদাহরণ অধিক সংগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু যে দুই তিনটি মনে আসিতেছে তাহাতে আমাদের কথা খাটে। যথা—অন্বেষণ, ধন্বন্তরী, মন্বন্তর।

এইখানে গুটিকত ব্যতিক্রমের কথা বলা আবশ্যক। ই, উ, য ফলা, ক্ষ ফলা, ক্ষ পরে থাকিলেও অভাবার্থসূচক "অ"য়ের বিকার হয় না। যথা—অকিঞ্চন, অকুতোভয়, অখ্যাতি, অনৃত, অক্ষয়।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি নিয়ম মানেনা অর্থাৎ ই উ যফলা ক্ষফলা ইত্যাদি পরে না থাকা সত্বেও ইহাদের আদ্যক্ষরবর্ত্তী অ ও হইয়া যায়। মন্দ, মন্ত্র, মন্ত্রনা, নথ, মঙ্গল, ব্রহ্ম।

আমি এই প্রবন্ধে কেবল আদ্যক্ষরবর্ত্তী অকার উচ্চারণের নিয়ম লিখিলাম। মধ্যাক্ষর বা শেষাক্ষরের নিয়ম অবধারণের অবসর পাই নাই। মধ্যাক্ষরে যে প্রথম অক্ষরের নিয়ম খাটে না, তাহা একটা উদাহরণ দিলেই বুঝা যাইবে। "বল" শব্দে "ব" য়ের সহিত সংযুক্ত অকারের কোন পরিবর্ত্তন হয় না, কিন্তু "কেবল" শব্দের "ব"য়ে হ্রস্ব ওকার লাগে। ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণের নিয়মও সময়াভাবে বাহির করিতে পারি নাই। সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যদি কোন অধ্যবসায়ী পাঠক রীতিমত অন্বেষণ করিয়া এই সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিতে পারেন তবে আমাদের বাঙ্গলা ব্যাকরণে একটি অভাব দূর হইয়া যায়।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক, যে, প্রকৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ একখানিও প্রকাশিত হয় নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের একটু ইতস্তত করিয়া তাহাকে বাঙ্গলা ব্যাকরণ নাম দেওয়া হয়।

বাঙ্গলা ব্যাকরণের অভাব আছে, ইহা পূরণ করিবার জন্য ভাষাতত্ত্বানুরাগী লোকের যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

একটি অপূর্ব্ব বাড়ি।

মনুষ্য জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, অসভ্য মানুষ প্রথমে মাটির নীচে গর্ত্ত খুঁড়িয়া বাস করিত ক্রমে পাতার ঘর খড়ের ঘর খোলার ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সভ্যতার যখন চূড়ান্ত উন্নতি হইল, তখন ইঁটের গাঁথনি পাথরের গাঁথনি পাকা ইমারৎ-সব প্রস্তুত করিতে লাগিল। আজ কালতো আবার কথাই নাই। গৃহ-নিবাসীর সুখের জন্য কত রকম সুবিধাজনক আয়োজন বাড়িতে রাখা হইতেছে। টেলিফোন টেলিগ্রাফ গ্যাস জলের কল, কত কি।

কিন্তু আর একটি অপূর্ব্ব বাড়ি আছে, সে বাড়িটি মানুষের সৃষ্টি হওয়া অবধি চলিয়া আসিতেছে অথচ এখনকার কালের বাড়ি নির্ম্মাণের যে সব উন্নতি হইয়াছে, বাড়ির অভ্যন্তরে যে সকল সুবিধাজনক আয়োজন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সেই অপূর্ব্ব বাড়িটিতে প্রথম হইতেই তাহা আছে।

এই অপূর্ব্ব বাড়িটি কি বল দেখি? মানুষের শরীর।

আমাদের ঘরবাড়ি ইঁট বাঁশ পাথর মাটি কতকি দিয়ে তৈরি হয়। আবার তাহা কাদা, বালি সুরকি চুন কতকি মস্‌লা দিয়া গাঁথা হয়। আমাদের শরীররূপ বাড়িটিও নানা উপাদানে নির্ম্মিত। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি এই উপাদানগুলি কি। রসায়ন শাস্ত্র বলেন, অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন এই দুই বাষ্প মিলিয়া জল হইয়াছে এবং অক্সিজেন ও নাইট্রেজেন এই দুই বাষ্প মিশিয়া বায়ু হইয়াছে। একটি কাঁচের টুক্‌রা পরীক্ষা করিয়া রাসায়নিক পণ্ডিত দেখিয়াছেন সিলিসিক আসিড্‌ আর পোটাসা কোন নির্দ্দিষ্ট ভাগে মিশিয়া কাচ হইয়াছে। লাল নীল ও হলিদা এই তিনটি মূল বর্ণের মিশ্রণে দেখুন অন্যান্য রং হয় সেইরূপ কতকগুলি মূল উপাদানের মিশ্রনে এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

যত দূর জানা গিয়াছে, ৬৩ প্রকার মূল উপাদান আছে। ইহাতে সমস্ত জগৎ নির্ম্মিত। এই মূল উপাদানের প্রায় চতুর্থাংশ আমাদের শরীরে ব্যবহৃত হয়। কি কি?—না অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন, কার্ব্বন্‌ (কয়লা) গন্ধক, ফস্‌ফরস্‌, সিলিকন্‌ (অর্থাৎ চুন) ম্যাগ্‌নেসিয়ম এবং লোহা।

লোহা থাকাতেই আমাদের রক্ত লাল হইয়াছে। চুলে, পিত্তেতে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশে লোহা আছে। যাহাতে কাচ হয় সেই সিলিকা পদার্থ আমাদের চুলে এবং নখে পাওয়া যায়। আর একটি কাচের উপাদান যে পোটাসা তাহা আমাদের রক্তে মাংশ পেশীতে এবং শরীরের তরল পদার্থ সকলে পাওয়া যায়। হাড় ও দাঁতে চুন আছে।

গাছ পালা উদ্ভিদ্ চুন ও সিলিকা আহার করে আমরা আবার ঐ শাক সব্জি উদ্ভিদ আহার করিয়া চুন ও সিলিকা আত্মসাৎ করি। এই বিবিধ উপাদান সকল আমরা আমাদের খাদ্য হইতে অর্জ্জন করি। যদি আমাদের হাড় যথেষ্ট পরিমাণে চুন না খায় আমাদের রক্ত যথেষ্ট পরিমাণে লোহা না পায় তাহা হইলেই আমাদের শরীর বেমেরামৎ হইয়া পড়ে অর্থাৎ আমরা পীড়িত হই।

আমাদের এই অপূর্ব্ব বাড়িটি কি প্রকারে গঠিত হইয়াছে তাহা ভাল করিয়া আলোচনা করা যাউক।

আমাদের শরীর অসংখ্য কোষ সমূহের সমষ্টি। অর্থাৎ ছোট ছোট থলের মত জিনিসের মধ্যে একরকম তরল থল্‌থলে পদার্থ ভরা থাকে। এই অসংখ্য কোষ কিম্বা খোলের দ্বারা আমাদের সমস্ত শরীর গঠিত। এই কোষ সকলের মধ্যে যে থল্‌থলে তরল পদার্থ থাকে তাকে ইংরাজিতে Protoplasm বলে। এই কোষ-গুলি এত ছোট যে খুব ভাল অনুবীক্ষণ না হইলে উহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল কোষ ক্রমাগত মরিয়া যাইতেছে আবার নূতন কোষ সকল প্রস্তুত হইয়া তাহাদিগের স্থান নিয়ত অধিকার করিতেছে। শরীরের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু ক্রমাগত চলিতেছে। আমাদের প্রতি কথাতে প্রতি চিন্তাক্রিয়াতে প্রতি গতিতে আমাদের শরীরের কোন না কোন অংশ নষ্ট হইতেছে আবার ঠিক তাহার অনুরূপ গঠিত হইতেছে। যদি এইরূপ গঠিত না হইত তাহা হইলে আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদিগকেও অল্পক্ষণের মধ্যে আর চিনিতে পারিতাম না।

অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা যখন বাড়তির মুখে থাকে তখন এত নূতন কোষ তাহাদের শরীরে যোজিত হয় যে তাহারা বড় হইয়া উঠিলে কতকটা তাহাদের চেহারার বদল হয়। কিন্তু এতটা বদল হয় না যে একেবারে চেনা যায় না। মূল আদর্শের সহিত কতকটা সাদৃশ্য থাকে। আমাদের শরীরের কোন্ স্থানে যদি কোন কাটা দাগ থাকে সেইস্থানের অংশ কালে একেবারে নূতন হইয়া যায় বটে কিন্তু সেই একই ছাঁচ বজায় থাকে।

আমাদের এই অপূর্ব্ব বাড়িগুলি কিরূপ করিয়া তৈরি হয় কি করিয়া নষ্ট হয় কি করিয়া মেরামৎ করিতে হয় তাহা জানা খুব দরকার।

আমাদের শরীরের কোষগুলির নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু আছে—সেই নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলেই তাহারা মরিয়া যায়—মরিয়া গেলে শরীর হইতে তাহাদিগকে যদি বাহির করিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলেই পীড়ার কারণ উপস্থিত হয়।

শরীরের চালনায় এই কোষ সকল ধ্বংশ হয় এবং শরীর হইতে ঐ মৃত অংশ সকল বাহির করিয়া দিবারও সুবিধা হয়। এই জন্যই ব্যায়াম এত উপকারী। শরীর চালনা ও ব্যায়ামের দ্বারা নষ্ট কোষাংশ সকল বহিষ্কৃত হইলে নূতন কোষাংশ সকলের জন্য

নূতন উপাদান সংগ্রহের আবশ্যকতা ও আকাঙ্খা জন্মে। এই আকাঙ্খার নামই ক্ষুধা। ক্ষুধার উত্তেজনে আহার করিলে খাদ্যসামগ্রী হইতে নূতন কোষ সকল নির্ম্মিত হয়। এই কোষ সকলকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট জীবনকালের পূর্ব্বেই ব্যায়ামের দ্বারা ধ্বংশ করিয়া ফেলা ভাল—নচেৎ যদি তাহাদিগকে বৃদ্ধ হইয়া মরিতে দেওয়া যায়—তাহা হইলে শরীরের নিশ্চেষ্টতার দরুন মৃত অংশ সকলকে শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা কঠিন হয়—সুতরাং সেই সকল মৃত অংশ শরীরের মধ্যে আটকাইয়া থাকে এবং নানা রোগ সৃষ্টি করে।

যদি কাজ কর্ম্ম খেলাধুলা শরীর চালনা যথাপরিমাণে কর, যদি সময়মত যথা-পরিমাণে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী আহার কর—যদি যথাপরিমাণে নিদ্রা যাও তাহা হইলে দেখিবে তোমার চির-ভঙ্গুর শরীর মন্দির যেমন ভাঙ্গিতেছে অমনি আপনাআপনি মেরামৎ হইতেছে—নূতন তৈরি হইতেছে।

বনপ্রান্ত।

(ছবি।)

বনটী বহুদূরবিস্তৃত নয় কিন্তু খুব ঘন। স্থানে স্থানে এমন কি সূর্য্যালোক পর্য্যন্তও পঁহুছায় না। নানা প্রকার বড় বড় গাছপালার মধ্যে মধ্যে এক একটী পলাশ গাছে লাল লাল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন কোথাও বড় বড় তালগাছ আকাশ ধরিবার জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কোথাও একটী বৃদ্ধ বটবৃক্ষ একটা পুরাতন ভগ্ন প্রাচীরের সহিত সহস্র বন্ধুত্ব বাঁধনে মিলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া সহস্র বাহুতে কোলাকুলি করিতেছে। কোথাও একটী ক্ষুদ্র বন্যলতা একটী বড় পেয়ারা গাছকে জড়াইয়া উঠিতেছে এবং পেয়ারা গাছটী তাহার সমস্ত ডালপালা সমেত তাহার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচুটী গাছ বড়গাছের ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে একটী বৃক্ষ হইতে আর একটী বৃক্ষ পর্য্যন্ত মাকড়সারা জাল নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সকল গাছপালার মধ্যে দিয়া ভাঙ্গা বাঁকাচোরা রাস্তা গিয়াছে।

রাস্তাটী যে বরাবর স্পষ্ট তাহা নহে। রাস্তার মধ্যে মধ্যে বড় বড় ঘাস জন্মিয়া আশেপাশের ঘাসগুলির সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া বা এই বন দিয়া গরুর গাড়িটী ক্যাঁচ কোঁচ করিতে করিতে চলিয়াছে।

সহরের গরুর গাড়ীর মত এ গাড়ী খোলা নহে। দুই চারিটা বাঁশের খিলানমত করা

আছে তাহার পরে একটী কাপড় বিছান। গাড়ীর সম্মুখভাগে গাড়োয়ান একটা চাবুক হস্তে বসিয়া রহিয়াছে এবং আবশ্যক হইলে বা না হইলে সেই চাবুকের বাঁট দিয়া গরুদিগের পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে গুঁতা দিতেছে। ইহা বাদে মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দুই চারিটী মনুষ্যোচিত গালি এবং অসংখ্য 'হ্যাট্ হুট্' দিবারও বিরাম নাই।

যাইতে যাইতে গাড়ীর সম্মুখে একজন বুড়ী পড়িল। গাড়োয়ান "এইবুড়ী" করিয়া অমনি একটা হাঁক্ দিল। বুড়ী কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে কহিল "আ মর্ মিন্সে চোকে কি দেখতে পাস্‌নে! আ মোলো যা"। কিন্তু ইহা বলিয়াও বুড়ার মনস্তুষ্টি হইল না, বুড়ী আপন মনে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল বক্‌বক্ করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। গাড়োয়ান আর অধিক কিছু না বলিয়া গরুদিগকে এক একবার লেজমলা দিয়া 'হেট্ হুট্' করিতে করিতে চলিল।

বেশ বেলা হইয়াছে। সূর্য্যদেব বহুক্ষণ উঠিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল রশ্মিগুলি বৃক্ষের পত্রে, কোথায়ও শ্যামল ঘাসের পরে, কোথাও একটা ভগ্ন প্রাচীরের উপরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। নীলাকাশের অধিকাংশই শাদা হইয়া আসিয়াছে। সমীরণের শীতলতা কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। গরুর গাড়ীটী এই সময়ে বনের প্রান্তভাগে আসিয়া দাঁড়াইল।

বনের প্রান্তভাগে একটী প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের ধারে ধারে নালাগুলিতে জল দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্যালোক তাহারই মধ্যে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে। কৃষকেরা এখনও কেহ কেহ আসে নাই। এই মাঠের মধ্যে গাড়োয়ান গরু দুইটাকে খুলিয়া দিল।

গরু দুইটী খোলা পাইয়া মনের সাধে ঘাস খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়োয়ান একটা গাছে ঠেস দিয়া মুড়ী চিবাইতে লাগিল। আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া কেহ গাছতলায় বসিল, কেহ জল পান করিল, কেহ স্বীয় শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ সজোরে একআধ টান তামাকু টানিয়া অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া দিল। যাহা হোক্ আরোহীদিগের স্নানাহার শীঘ্রই শেষ হইল এবং সকলে নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

বনের প্রান্তভাগে অধিক গাছপালা না থাকায় কেহ কেহ গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিল। দু একজন বাহিরে শয়ন করিল। গাড়োয়ান প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা এদিক ওদিক করিয়া গরু দুইটাকে ধরিল এবং নিজে মাটীতে শয়ন করিল। বলা বাহুল্য যে শীঘ্রই সকলে নিদ্রামগ্ন হইল।

এখন দ্বিপ্রহর। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী তাতিয়া উঠিয়াছে। গাছপালাগুলি গ্রীষ্মের প্রখর তাপে অবসন্ন হইয়া ম্লানমুখে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাতাস একটুও নাই, সব নিস্তব্ধ। কৃষকেরা মাঠে আপন মনে কাজকর্ম্ম করিতেছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পুষ্করিণীতে নামিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ একটী

গাছের তলায় বসিয়া ভাত খাইতেছে, কেহ ভাতের গ্রাস মুখে করিয়া একটা ডাঁটা চিবাইতেছে, এবং কেহ ভাত খাইয়া তামাকু টানিতেছে।

মাঠের মধ্যস্থলে একটা অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। তাহার তলে বসিয়া একজন কৃষক তাহার ছোট মেয়েটার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ভাত খাইতেছে। মেয়েটী বলিল "বাবা আজ চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে!"

বাবা। বেশ হয়েছে মা, তুমি আমার মা, যা রাঁধ তাই কেমন বেশ খেতে হয়।

এই বলিয়া কৃষক কাঁসার ঘটি হইতে ঢক্ ঢক্ করিয়া খানিকটা জল পান করিল। জল পান করিয়া কৃষক মেয়েটীর নিকট হইতে একটী পান লইয়া খাইল এবং তাহাকে এক ছিলিম তামাকু সাজিতে বলিল। মেয়েটী তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল ফিরাইয়া চকমকি ঠুকিয়া আগুণ্ করিয়া তামাক ঠিক করিল। কৃষক তামাকু টানিতে লাগিল। মেয়েটী স্থানটী জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাতের বাসন কোসন গুলি লইয়া একটী পুষ্করিণীর ধারে গেল এবং বাসনগুলি বেশ করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

মেয়েটী চলিয়া গেলে কৃষক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু গ্রীষ্মের প্রখরতা প্রযুক্ত তাহার শীঘ্রই তন্দ্রা আসিল। কৃষক থাকিয়া থাকিয়া একএক বার ঢুলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহভাজন হইল।

আমার সেই গুরুর গাড়িটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গাড়িও চলিয়াছে বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই। সে যে সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে সেই সুনির্ম্মল ক্ষেত্রে তাহার চাকার একটি চিহ্নও পড়েনা, কেবল তাহার চারিদিকে তাহার পথের পার্শ্বে তারা ফুটিয়া উঠে, চাঁদ হাসিয়া চায়, সূর্য্য জাগিয়া উঠে; তাহার চারিদিকে জন কোলাহল, জন্ম মৃত্যু, সংসারের যোঝাযুঝি; কিন্তু সে কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মুখের উপরে গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া একাকী নিঃশব্দে মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বা বীজ বপন করিয়া যাইতেছে কোথাও বা শস্য কাটিয়া যাইতেছে। কেহ তাহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কথার উত্তর দেয় না।

কিছুই বৃথা যায় না।

নেপোলিয়নের মাতা একদা নেপোলিয়ন ও তাঁহার ভগ্নী ইলিজা দুই জনকে দুইটী প্রজাপতি প্রভৃতি ধরার জাল দেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে বাগানের বেড়ার বাহিরে যাইতে বারণ করেন। তাঁহারা জাল পাইয়া মহানন্দে বাগানে খেলা করিতেছেন এমন সময়ে

একটী ক্ষুদ্র প্রজাপতির উপর তাঁহাদের চোখ পড়িল। অমনি তাঁহারা সেইটী ধরিতে ছুটিলেন। প্রজাপতি বাগানের বাহিরে চলিয়া গেল। নেপোলিয়নও তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া বেড়া অতিক্রম করিলেন। এবং বোনকেও নামাইয়া লইয়া দুইজনে প্রজাপতির অনুসরণে ছুটিলেন। ওই মা! একি হইল। মনের উচ্ছাসে ছুটিতে ছুটিতে ইলিজা একটী ডিমবিক্রেতা মেয়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়েটী পড়িয়া গিয়া কাঁদিতেছে এবং তাহার প্রায় সব ডিমগুলিই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইলিজা তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া নেপোলিয়নকে বলিল, "চল ভাই আমরা পালাই, এ মেয়েটীও আমাদের চেনে না আর তা ছাড়া এ বিষয় মায়ের কাণে ওঠারও কোন সম্ভাবনা নাই।" নেপোলিয়ন বলিলেন "না, যা ঘটে ঘটুক, আমি পালাইব না, দেখিতেছ না মেয়েটী কত কাঁদিতেছে? আমি যাহা পারি উহার সাহায্য করিব। আমরা উহার ক্ষতি করিয়াছি যতদূর পারি তাহা পূরণ করা উচিত।" ইলিজা একটু লজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কারণ, ক্ষতি আসলে সেই করিয়াছে, অথচ সে পালাইতে বলিল আর নেপোলিয়ন দুজনের ঘাড়ে দোষ লইয়া সাহায্য করিতে চাহিল!

মেয়েটী অত্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—এই ডিমবিক্রয় করিয়া যা কিছু পয়সা পাওয়া যাইত, তাহাতে তাহাদের পরিবারের তিন দিন আহার চলিত। সে এখন কি করিয়া ক্ষুধিত পরিবারের নিকট যাইয়া বলিবে যে তিনদিনের মত তাহারা আহার পাইবে না? এ তিন দিন তাহারা কি খাইয়া থাকিবে? বিশেষ তাহার মা শয্যাগতা।—এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ন তাঁহার পকেট হইতে ২টী ফ্লরিন লইয়া তাহাকে দিয়া বলিলেন, "আমাদের যাহা সাধ্য দিতেছি তুমি আর কাঁদিও না।" ইলিজা নেপোলিয়নকে এইরূপ দান করিতে দেখিয়া ব্যগ্র ভাবে বলিয়া উঠিল "ভাই, ও কি করিলে? আমরা যে শুধু রুটী ছাড়া আজ আর কিছুই খাইতে পাইব না"—এই ফ্লরিন দুটী তাহাদের জলখাবারের পয়সা। নেপোলিয়ন বলিলেন "তা কি করিব? আমাদের দোষে উহারা কেন কষ্ট পাইবে?" এইরূপ কথোপকথন চলিতেছে, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া বলিল নেপোলিয়নের মাতা তাহাদিগকে ডাকিয়াছেন। নেপোলিয়ন ডিমবিক্রেতা বালিকাকে তাঁহাদের অনুসরণ করিতে বলিয়া দাসীর সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। বাড়ী গিয়া মাতার কাছে যাইবামাত্র তিনি তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "আমি তোমাদিগকে বেড়ার পারে যাইতে বারণ করিয়াছিলাম তোমরা আমার কথা শোনো নাই, ও জাল আর তোমরা পাইবে না, আমাকে ফিরাইয়া দাও"। নেপোলিয়ন এই কথা শুনিয়া বলিলেন "মা ইলিজার কোন দোষ নাই, আমিই প্রথম বেড়ার ওদিকে যাইয়া উহাকে নাবাইয়া লইয়াছিলাম" ইলিজা এইরূপে নিজের দোষ কাটিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল নয়নে ভ্রাতার দিকে চাহিল। ইলিজার মামাও এই ঘরে ছিলেন, তিনি নেপোলিয়নকে এইরূপ দোষ স্বীকার করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া নেপোলিয়নের মাতাকে বলিলেন, "নেপোলিয়ন নিজের

দোষ স্বীকার করিয়াছে অতএব আমার অনুরোধে তাহাকে ক্ষমা কর।" ভ্রাতার অনুরোধে নেপোলিয়নের মা তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ইলিজা তখন অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মামাকে বলিল "মামা তুমি কি আমার হইয়া মাকে একটু বলিবে না? আমি যে নেপোলিয়ন অপেক্ষাও বেশী দোষ করিয়াছি।" মামা বলিলেন তোমার দোষ কি আগে বল পরে বিচার করিব। ইলিজা তখন ডিম ভাঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত ঘটনাই বলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে ইলিজাও ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। তখন নেপোলিয়ন তাঁহার মাকে বলিলেন মা তুমি যদি আমাকে দুইটী ফ্রাঙ্ক ধার দাও তবে আমি এখন এই ডিম বিক্রেতা বালিকাকে তাহার ডিমের মূল্য দিতে পারি। তার পর আমি তোমার নিকট যে আধ ফ্রাঙ্ক পাই করিয়া তাহাতেই ক্রমশঃ ধার শুধিব। মা বলিলেন কিন্তু বুঝিয়া দেখ, তাহা হইলে তুমি আর ৪ মাসের মধ্যে কিছুই পাইবে না। নেপোলিয়ন তাহাতেও সম্মত হইয়া ফ্রাঙ্ক দুইটী লইয়া বালিকাকে দিলেন। বালিকা সন্তুষ্ট হইল এবং পূর্ব্বপ্রদত্ত ফ্লরিন দুইটী ফিরাইয়া দিতে চাহিল। বালিকার এইরূপ সততা দেখিয়া নেপোলিয়নের মাতা সন্তুষ্ট হইলেন, এবং নেপোলিয়নের অনুরোধে কিছু সাহায্য করিবার ইচ্ছায় নেপোলিয়ন ও ইলিজাকে সঙ্গে লইয়া বালিকার অনুবর্ত্তী হইলেন। তাহাদের বাড়ী গিয়া দেখিলেন বালিকার মা শয্যাগতা এবং পাশে কয়েকটী শিশু কাঁদিতেছে, ইলিজা ও তাহার মা যাইয়া তাহাদের শুশ্রূষা করিতে বসিলেন। একটী বড় বালককে কিছু দূরে বসিয়া কাজ করিতে দেখিয়া নেপোলিয়ন যাইয়া তাহারই সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

এই বালকের নাম জাকোপা। ক্রমে ক্রমে নেপোলিয়নের সহিত এই বালকটীর বিলক্ষণ ভাব হইল। নেপোলিয়ন সর্ব্বদাই তাহাদের বাড়ী যাইতেন ও সাধ্যমত তাহাদের সাহায্য করিতেন। জাকোপাও তাহার বন্ধুকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। হায়! তাহাদের এ বন্ধুতার সুখ বেশী দিন রহিল না। দশম বৎসরে পড়িবামাত্রই নেপোলিয়ন জন্মের মত কর্সিকা পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, কাজেই তাঁহার বাল্য সখারও নিকট বিদায় লইতে হইল। যাইবার সময় নেপোলিয়ন জাকোপাকে স্বনামখোদিত একটী ক্ষুদ্র বাক্স উপহার দিয়া গেলেন। জাকোপা তাহা অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিল এবং প্রতিজ্ঞা করিল জীবন থাকিতে এ বাক্স সে কখনই কাছছাড়া করিবে না।

* * * * * *

এই ঘটনার পর আজ অনেক বৎসর চলিয়া গেছে। যে বালকের আগে একটী ফ্লরিন অভাবে নিরাহারে থাকিতে হইত আজ সে রাজরাজেশ্বর—আজ সে ফ্রান্সের সম্রাট, দুর্গম আল্প পর্য্যন্তও তাঁহার গতিরোধ দানে সমর্থ নহে, সমস্ত ইয়ুরোপ আজ তাঁহার নামে কম্পিত।

কিন্তু এখনও তাঁহার জয়ের আশা মিটে নাই। ঐ দেখ জয়াশায় এখনও তিনি যুদ্ধে

ব্যস্ত। অশ্বের রবে, কামানের গর্জ্জনে, ধূমে, রণবাদ্যে, আহতদিগের চীৎকারে রণস্থল এক ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিন্তু জয়লক্ষ্মীকে আলিঙ্গন করিতে নেপোলিয়ন কোথায় না অগ্রসর হইতে পারেন! হায়! জয়লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে এইবার বুঝি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হয়! ঐ দেখ একজন শত্রুসেনা নেপোলিয়নের উপর অস্ত্র তুলিয়াছে—এমন সময়ে একজন ফরাসী সেনা নক্ষত্রবেগে ছুটীয়া আসিয়া নেপোলিয়নের স্থল অধিকার করিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিল বটে কিন্তু নিজে আহত হইল। নেপোলিয়ন তখন তাঁহার প্রাণদাতার দিকে চাহিলেন। চাহিবামাত্র নেপোলিয়নের মনে একটী পুরাণ স্মৃতি আসিল, অথচ কিছুই ভাল করিয়া স্মরণ হইল না। এ মুখ যেন চেনা চেনা, অথচ কোথায় দেখিয়াছেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছেন না, এমন সময় তাহার হস্তে একটী ক্ষুদ্র বাক্স দেখিতে পাইলেন। চকিতের মধ্যে নেপোলিয়নের মনে সমস্ত স্মৃতি স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল, এ সৈনিক আর কেহ নহে তাঁহারই বাল্যসখা জাকোপা। জাকোপা তাহার বন্ধুকে এত ভাল বাসিত যে তিনি আসিলে পর না থাকিতে পারিয়া এখানে আসিয়া তাঁহার অধীনস্থ কোন সেনাপতির অধীনে কাজ লয়। তখন নেপোলিয়ন রাজরাজেশ্বর, জাকোপা সামান্য সৈনিক মাত্র। দেখা শুনা হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। কিন্তু তবুও বন্ধুর অধীনে আছে এই বিচার করিয়া সে সুখী হইত। এখন হইতে তাঁহাদের পুরাতন বন্ধুতা আবার জাগিয়া উঠিল। জাকোপা জয়ে পরাজয়ে সুখে দুঃখে বিপদে ছায়ার ন্যায় প্রভুর অনুসরণ করিত। যখন তাঁহার আর কেহই ছিল না তখনও জাকোপা ছিল। এই যুদ্ধের কয়েক বৎসর পরেই প্রসিদ্ধ ওয়াটারলুর যুদ্ধে বন্দী হইয়া নেপোলিয়ান সেণ্ট হেলেনায় প্রেরিত হ'ন। তিনি যতদিন সমুদ্রে জাহাজে ছিলেন জাকোপা তাঁহার উদ্ধার সাধনের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহার সহিত কারাবাসের প্রার্থনা করে। নেপোলিয়ন শৈশবে এক দিন জাকোপার উপকার করিয়াছিলেন—সে উপকার জাকোপা জীবনে ভোলে নাই। যখন নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় একাকী আবদ্ধ ছিলেন, তখন জাকোপা ভিন্ন তাঁহার সঙ্গে আর কেহই ছিল না। প্রভুভক্ত জাকোপা মরণ পর্য্যন্তও তাঁহার সঙ্গে ছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার যা কিছু অবশিষ্ট লইয়া ফ্রান্সে প্রত্যাগমন করে। এখন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে জাকোপার প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। এ পৃথিবীতে কিছুই বৃথা যায় না। নেপোলিয়নের পর জীবন নিষ্ঠুরই হোক আর যাহাই হোক আমাদের এখানে সে কথার দরকার নাই কিন্তু শৈশবে যে ভাল কাজ করিয়াছিলেন মরণ পর্য্যন্ত তাহার ফল ভোগ করিয়াছেন। জাকোপা না থাকিলে তাঁহার বিজন দ্বীপের অন্তিম শয্যা যে আরও কত কষ্টকর হইত তাহা বলা যায় না।

২৮৩

রাজর্ষি।

দশম পরিচ্ছেদ।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহারাজ নিয়মিত রাজকার্য্য সমাপন করিলেন। প্রাতঃকালের সূর্য্যালোক আচ্ছন্ন হইয়া গেছে। মেঘের ছায়ায় দিন আবার অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মহারাজ অত্যন্ত বিমনা আছেন। অন্যদিন রাজসভায় নক্ষত্ররায় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি উপস্থিত ছিলেন না। রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন তিনি ওজর করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ। রাজা স্বয়ং নক্ষত্ররায়ের কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নক্ষত্র মুখ তুলিয়া রাজার মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া কাজে ব্যস্ত আছেন এমনি ভান করিলেন। রাজা বলিলেন "নক্ষত্র, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

নক্ষত্র কাগজের এপিঠ ওপিঠ উল্টাইয়া হাতের অঙ্গুরী নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "অসুখ? না, অসুখ ঠিক নয়—এই, একটুখানি কাজ ছিল—হাঁ হাঁ অসুখ হয়েছিল—কতকটা অসুখের মতন বটে।" নক্ষত্ররায় নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, গোবিন্দ মাণিক্য অতিশয় বিষণ্ণ মুখে নক্ষত্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়, স্নেহের নীড়ের মধ্যেও হিংসা ঢুকিয়াছে, সে সাপের মত লুকাইতে চায়, মুখ দেখাইতে চায় না। আমাদের অরণ্যে কি হিংস্র পশু যথেষ্ট নাই—শেষে কি মানুষও মানুষকে ভয় করিবে, ভাইও ভাইয়ের পাশে গিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বসিতে পাইবে না? এ সংসারে হিংসা লোভই এত বড় হইয়া উঠিল, আর স্নেহ প্রেম কোথাও ঠাঁই পাইল না!—এই আমার ভাই ইহার সহিত প্রতিদিন এক গৃহে বাস করি, একাসনে বসিয়া থাকি, হাসিমুখে কথা কই—এও আমার পাশে বসিয়া মনের মধ্যে ছুরি শানাইতেছে!—গোবিন্দ-মাণিক্যের নিকট তখন সংসার হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যের মত বোধ হইতে লাগিল। অন্ধকারের মধ্যে কেবল চারিদিকে দন্ত ও নখরের ছটা দেখিতে পাইলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মহারাজ মনে করিলেন এই স্নেহপ্রেমহীন হানাহানির রাজ্যে বাঁচিয়া থাকিয়া আমি আমার স্বজাতির আমার ভাইদের মনে কেবল হিংসা লোভ ও দ্বেষের অনল জ্বালাইতেছি—আমার সিংহাসনের চারিদিকে আমার প্রাণাধিক আত্মীয়েরা আমার দিকে চাহিয়া মনে মনে মুখ বক্র করিতেছে, দন্ত ঘর্ষণ করিতেছে, শৃঙ্খলবদ্ধ ভীষণ কুক্কুরের মত চারিদিক হইতে আমার উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িবার অবসর খুঁজিতেছে। ইহা অপেক্ষা ইহাদের খর নখরাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইহাদের রক্তের তৃষা মিটাইয়া এখান হইতে অপসৃত হওয়াই ভাল! প্রভাত-আকাশে গোবিন্দ-মাণিক্য যে প্রেম মুখচ্ছবি দেখিয়া ছিলেন তাহা কোথায় মিলাইয়া গেল!

উঠিয়া দাঁড়াইয়া মহারাজ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "নক্ষত্র, আজ অপরাহ্ণে গোমতী তীরের নির্জ্জন অরণ্যে আমরা দুই জনে বেড়াইতে যাইব।"

রাজার এই গম্ভীর আদেশবাণীর বিরুদ্ধে নক্ষত্রের মুখে কথা সরিল না, কিন্তু সংশয়ে ও আশঙ্কায় তাঁহার মন আকুল হইয়া উঠিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল মহারাজ এতক্ষণ নীরবে দুই চক্ষু তাঁহারই মনের দিকে নিবিষ্ট করিয়া বসিয়াছিলেন—সেখানে অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে যে ভাবনা গুলো কীটের মত কিল্‌বিল্‌ করিতেছিল সে গুলো যেন সহসা আলো দেখিয়া অস্থির হইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ভয়ে ভয়ে নক্ষত্ররায় রাজার মুখের দিকে একবার চাহিলেন—দেখিলেন তাঁহার মুখে কেবল সুগভীর বিষণ্ণ শান্তির ভাব, সেখানে রোষের রেখা মাত্র নাই। মানবহৃদয়ের কঠিন নিষ্ঠুরতা দেখিয়া কেবল সুগভীর শোক তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। তখনও মেঘ করিয়া আছে। নক্ষত্ররায়কে সঙ্গে লইয়া মহারাজ পদব্রজে অরণ্যের দিকে চলিলেন। এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে, কিন্তু মেঘের অন্ধকারে সন্ধ্যা বলিয়া ভ্রম হইতেছে—কাকেরা অরণ্যের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া অবিশ্রাম চীৎকার করিতেছে—কিন্তু দুই একটা চিল এখনও আকাশে সাঁতার দিতেছে। দুই ভাই যখন নির্জ্জন বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন তখন নক্ষত্ররায়ের গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। বড় বড় প্রাচীন গাছ জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা একটি কথা কহে না, কিন্তু স্থির হইয়া যেন কীটের প্রদশব্দটুকু পর্য্যন্তও শোনে, তাহারা কেবল নিজের ছায়ার দিকে, তলস্থিত অন্ধকারের দিকে অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া থাকে। অরণ্যের সেই জটিল রহস্যের ভিতরে পদক্ষেপ করিতে নক্ষত্ররায়ের পা যেন আর উঠে না—চারিদিকে সুগভীর নিস্তব্ধতার ভ্রূকুটি দেখিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের অত্যন্ত সন্দেহ ও ভয় জন্মিল। ভীষণ অদৃষ্টের মত নীরব রাজা এই সন্ধ্যাকালে এই পৃথিবীর অন্তরাল দিয়া তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইতেছেন কিছুই ঠাহর পাইলেন না। নিশ্চয় মনে করিলেন রাজার কাছে ধরা পড়িয়াছেন—এবং গুরুতর শাস্তি দিবার জন্যই রাজা তাঁহাকে এই অরণ্যের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। নক্ষত্ররায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাইতে পারিলে বাঁচেন, কিন্তু মনে হইল কে যেন তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে। কিছুতেই আর পরিত্রাণ নাই।

অরণ্যের মধ্যস্থলে কতকটা ফাঁকা। একটি স্বাভাবিক জলাশয়ের মত আছে, বর্ষাকালে তাহা জলে পরিপূর্ণ। সেই জলাশয়ের ধারে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রাজা বলিলেন "দাঁড়াও!" নক্ষত্ররায় চমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনে হইল রাজার আদেশ শুনিয়া সেই মুহূর্ত্তে কালের স্রোত যেন বন্ধ হইল—সেই মুহূর্ত্তেই যেন অরণ্যের বৃক্ষগুলি যে যেখানে ছিল ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল—নীচে হইতে ধরণী এবং উপর হইতে আকাশ যেন নিশ্বাসরুদ্ধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। কাকের কোলাহল থামিয়া গেছে, বনের মধ্যে একটী

শব্দ নাই—কেবল সেই "দাঁড়াও" শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া যেন গম্ গম্ করিতে লাগিল—সেই "দাঁড়াও" শব্দ যেন তড়িৎ প্রবাহের মত বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে শাখা হইতে প্রশাখায় প্রবাহিত হইতে লাগিল, অরণ্যের প্রত্যেক পাতাটা যেন সেই শব্দের কম্পনে রী রী করিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ও যেন গাছের মতই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা তখন নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে মর্ম্মভেদী স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "নক্ষত্র তুমি আমাকে বধ করিতে চাও!"

নক্ষত্র বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন—উত্তর দিবার চেষ্টাও করিতে পারিলেন না।

রাজা কহিলেন "কেন বধ করিবে ভাই? রাজ্যের লোভে? তুমি কি মনে কর রাজ্য কেবল সোনার সিংহাসন, হীরার মুকুট, ও রাজছত্র? এই মুকুট, এই রাজছত্র, এই রাজদণ্ডের ভার কত তাহা জান? শত সহস্র লোকের চিন্তা এই হীরার মুকুট দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি। রাজ্য পাইতে চাও ত সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ কর, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ কর, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন কর—এ যে করে সেই রাজা, সে পর্ণকুটীরেই থাক্ আর প্রাসাদেই থাক্! যে ব্যক্তি সকল লোককে আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে, সকল লোক ত তাহারই! তাহার ঐশ্বর্য্য তাহার গৌরব তাহার সুখ, অক্ষৌহিনী সৈন্য আসিয়া কাড়িতে পারে না। পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে সেই পৃথিবীর রাজা, পৃথিবীর অর্থ ও রক্ত শোষণ যে করে সে ত দস্যু—সহস্র অভাগার অশ্রুজল তাহার মস্তকে অহর্নিশি বর্ষিত হইতেছে, সেই অভিশাপধারা হইতে কোন রাজছত্র তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না। তাহার প্রচুর রাজভোগের মধ্যে শত শত উপবাসীর ক্ষুধা লুকাইয়া আছে, অনাথের দারিদ্র্য গলাইয়া সে সোনার অলঙ্কার করিয়া পরে, তাহার ভূমিবিস্তৃত রাজ-বস্ত্রের মধ্যে শত শত শীতাতুরের মলিন ছিন্নকন্থা। রাজাকে বধ করিয়া রাজত্ব মেলে না ভাই—পৃথিবীকে বশ করিয়া রাজা হইতে হয়!"

গোবিন্দমাণিক্য থামিলেন। চারিদিকে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। নক্ষত্র রায় মাথা নত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

মহারাজ খাপ হইতে তরবারি খুলিলেন। নক্ষত্ররায়ের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—"ভাই, এখানে লোক নাই, সাক্ষ্য নাই, কেহ নাই—ভাইয়ের বক্ষে ভাই যদি ছুরি মারিতে চায় তবে তাহার স্থান এই, সময় এই—এখানে কেহ তোমাকে নিবারণ করিবে না, কেহ তোমাকে নিন্দা করিবে না। তোমার শিরায় আর আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে, একই পিতা একই পিতামহের রক্ত—তুমি সেই রক্ত পাত করিতে চাও, কিন্তু মনুষ্যের আবাস স্থলে করিও না। কারণ, যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে। পাপের শেষ কোথায় গিয়া হয় কে জানে! পাপের একটি বীজ যেখানে পড়ে, সেখানে দেখিতে দেখিতে গোপনে কেমন করিয়া সহস্র

বৃক্ষ জন্মায়, কেমন করিয়া অল্পে অল্পে সুশোভন মানব সমাজ অরণ্যে পরিণত হইয়া যায় তাহা কেহ জানিতে পারে না।—অতএব নগরে গ্রামে, যেখানে নিশ্চিন্ত চিত্তে পরম স্নেহে ভাইয়ে ভাইয়ে গলাগলি করিয়া আছে, সেই ভাইদের নীড়ের মধ্যে ভাইয়ের রক্তপাত করিও না! এই জন্যই তোমাকে আজ অরণ্যে ডাকিয়া আনিয়াছি।"

এই বলিয়া রাজা নক্ষত্ররায়ের হাতে তরবারি দিলেন। নক্ষত্ররায়ের হাত হইতে তরবারী ভূমিতে পড়িয়া গেল। নক্ষত্ররায় দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "দাদা, আমি দোষী নই—এ কথা আমার মনে কখনও উদয় হয় নাই"—

রাজা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া বলিলেন—"আমি তাহা জানি—তুমি কি কখন আমাকে আঘাত করিতে পার!—তোমাকে পাঁচ জনে মন্দ পরামর্শ দিয়াছে।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন—"আমাকে রঘুপতি কেবল এই উপদেশ দিতেছে!"

রাজা বলিলেন "রঘুপতির কাছ হইতে দূরে থাকিও।"

নক্ষত্ররায় বলিলেন "কোথায় যাইব বলিয়া দিন্! আমি এখানে থাকিতে চাই না! আমি এখান হইতে—রঘুপতির কাছ হইতে পালাইতে চাই!"

রাজা বলিলেন—"তুমি আমারই কাছে থাক—আর কোথাও যাইতে হইবে না—রঘুপতি তোমার কি করিবে!"

নক্ষত্ররায় রাজার হাত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন, যেন রঘুপতি তাঁহাকে টানিয়া লইবে বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্ররায় রাজার হাত ধরিয়া অরণ্যের মধ্য দিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন তখনও আকাশ হইতে অল্প অল্প আলো আসিতেছিল—কিন্তু অরণ্যের নীচে অত্যন্ত অন্ধকার হইয়াছে। যেন অন্ধকারের বন্যা আসিয়াছে, কেবল গাছগুলোর মাথা উপরে জাগিয়া আছে। ক্রমে তাহাও ডুবিয়া যাইবে—তখন অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া আকাশে পৃথিবীতে এক হইয়া যাইবে।

প্রাসাদের পথে না গিয়া রাজা মন্দিরের দিকে গেলেন। মন্দিরের সন্ধ্যা আরতি সমাপন করিয়া একটি দীপ জ্বালিয়া রঘুপতি ও জয়সিং কুটীরে বসিয়া আছেন। উভয়েই নীরবে আপনাপন ভাবনা লইয়া আছেন। দীপের ক্ষীণ আলোকে কেবল তাঁহাদের দুই জনের মুখের অন্ধকার দেখা যাইতেছে। নক্ষত্ররায় রঘুপতিকে দেখিয়া মুখ তুলিতে পারিলেন না; রাজার ছায়ায় দাঁড়াইয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিলেন—রাজা তাঁহাকে পাশে টানিয়া লইয়া দৃঢ়রূপে তাঁহার হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন ও স্থিরনেত্রে রঘুপতির মুখের দিকে একবার চাহিলেন; রঘুপতি তীব্র দৃষ্টিতে নক্ষত্ররায়ের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। অবশেষে রাজা রঘুপতিকে প্রণাম করিলেন, নক্ষত্ররায়ও তাঁহার অনুসরণ

করিলেন—রঘুপতি প্রণাম গ্রহণ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন "জয়োস্তু—রাজ্যের কুশল?"

রাজা একটুখানি থামিয়া বলিলেন "ঠাকুর, আশীর্ব্বাদ করুন, রাজ্যের অকুশল না ঘটুক! এ রাজ্যে মায়ের সকল সন্তান যেন সদ্ভাবে প্রেমে মিলিয়া থাকে, এ রাজ্যে ভাইয়ের কাছ হইতে ভাইকে কেহ যেন কাড়িয়া না লয়, যেখানে প্রেম আছে সেখানে কেহ যেন হিংসার প্রতিষ্ঠা না করে! রাজ্যের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়াই আসিয়াছি। পাপ সঙ্কল্পের সজ্বর্ষণে দাবানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে—নির্ব্বাণ করুন, শান্তির বারি বর্ষণ করুন, পৃথিবী শীতল করুন।"

রঘুপতি কহিলেন "দেবতার রোষানল জ্বলিয়া উঠিলে কে তাহা নির্ব্বাণ করিবে? এক অপরাধীর জন্য সহস্র নিরপরাধী সে অনলে দগ্ধ হয়!"

রাজা বলিলেন—"সেইত ভয়, সেই জন্যই ত কাঁপিতেছি! সে কথা কেহ বুঝিয়াও বোঝে না কেন? আপনি কি জানেন না এ রাজ্যে দেবতার নাম করিয়া দেবতার নিয়ম লঙ্ঘন করা হইতেছে? সেই জন্যই অমঙ্গল আশঙ্কায় আজ সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসিয়াছি—এখানে পাপের বৃক্ষ রোপণ করিয়া আমার এই ধনধান্যময় সুখের রাজ্যে দেবতার বজ্র আহ্বান করিয়া আনিবেন না—আপনাকে এই কথা বলিয়া গেলাম, এই কথা বলিবার জন্যই আমি আজ আসিয়াছিলাম।" বলিয়া মহারাজ রঘুপতির মুখের উপর তাঁহার মর্ম্মভেদী দৃষ্টি স্থাপন করিলেন রাজার সুগম্ভীর দৃঢ় স্বর রুদ্ধ ঝটিকার মত কুটীরের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল। রঘুপতি একটা উত্তর দিলেন না, পৈতা লইয়া নাড়িতে লাগিলেন। রাজা প্রণাম করিয়া নক্ষত্ররায়ের হাত ধরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জয়সিংহও বাহির হইলেন। ঘরের মধ্যে কেবল একটী দীপ, রঘুপতি এবং রঘুপতির বৃহৎ ছায়া রহিল।

তখন আকাশের আলো নিবিয়া গেছে। মেঘের মধ্যে তারা নিমগ্ন। আকাশের কানায় কানায় অন্ধকার। পূবে বাতাসে সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথা হইতে কদম ফুলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে এবং অরণ্যের মর্ম্মর শব্দ শুনা যাইতেছে। ভাবনায় নিমগ্ন হইয়া পরিচিত পথ দিয়া রাজা চলিতেছেন, সহসা পশ্চাৎ হইতে শুনিলেন, কে ডাকিল—"মহারাজ!"

রাজা ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?,'

পরিচিত স্বর কহিল "আমি আপনার অধম সেবক, আমি জয়সিং। মহারাজ, আপনি আমার গুরু, আমার প্রভু। আপনি ছাড়া আমার আর কেহ নাই। যেমন আপনি আপনাব কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাত ধরিয়া অন্ধকারের মধ্যে দিয়া লইয়া যাইতেছেন তেম্‌নি আমারও হাত ধরুন, আমাকেও সঙ্গে লইয়া যান; আমি গুরুতর অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়াছি; আমার কিসে ভাল হইবে কিসে মন্দ হইবে আমি কিছুই জানি না।

আমি একবার বামে যাইতেছি একবার দক্ষিণে যাইতেছি, আমার কর্ণধার কেহ নাই!" সেই অন্ধকারের অশ্রু পড়িতে লাগিল, কেহ দেখিতে পাইল না, কেবল আবেগ ভরে জয়সিংহের আর্দ্র স্বর কাঁপিতে কাঁপিতে রাজার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। স্তব্ধ স্থির অন্ধকার, বায়ুচঞ্চল সমুদ্রের মত কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন "চল, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল!"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর দিন যখন জয়সিং মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূজার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। রঘুপতি বিমর্ষ মুখে একাকী বসিয়া আছেন। ইহার পূর্ব্বে কখন এরূপ অনিয়ম হয় নাই।

জয়সিং আসিয়া গুরুর কাছে না গিয়া তাঁহার বাগানের মধ্যে গেলেন। তাঁহার গাছপালাগুলির মধ্যে গিয়া বসিলেন। তাহারা তাঁহার চারিদিকে কাঁপিতে লাগিল, নড়িতে লাগিল, ছায়া নাচাইতে লাগিল। তাঁহার চারিদিকে পুষ্পখচিত পল্লবের স্তর, শ্যামল স্তরের উপর স্তর, ছায়াপূর্ণ সুকোমল স্নেহের আচ্ছাদন, সুমধুর আহ্বান, প্রকৃতির প্রীতিপূর্ণ আলিঙ্গন। এখানে সকলে অপেক্ষা করিয়া থাকে, কথা জিজ্ঞাসা করে না, ভাবনার ব্যাঘাত করে না, চাহিলে তবে চায়, কথা কহিলে তবে কথা কয়। এই নীরব শুশ্রূষার মধ্যে, প্রকৃতির এই অন্তঃপুরের মধ্যে বসিয়া জয়সিং ভাবিতে লাগিলেন; রাজা তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে রঘুপতি আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিলেন। জয়সিং সচকিত হইয়া উঠিলেন। রঘুপতি তাঁহার পাশে বসিলেন। জয়সিংহের মুখের দিকে চাহিয়া কম্পিতস্বরে কহিলেন "বৎস, তোমার এমন ভাব দেখিতেছি কেন? আমি তোমার কি করিয়াছি যে তুমি অল্পে অল্পে আমার কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছ?"

জয়সিং কি বলিতে চেষ্টা করিলেন, রঘুপতি তাহাতে বাধা দিয়া বলিতে লাগিলেন— "এক মুহূর্ত্তের জন্য কি আমার স্নেহের অভাব দেখিয়াছ? আমি কি তোমার কাছে কোন অপরাধ করিয়াছি জয়সিং? যদি করিয়া থাকি—তবে আমি তোমার গুরু, তোমার পিতৃতুল্য, আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি আমাকে মার্জ্জনা কর!"

জয়সিং সহসা বজ্রবিদ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন—গুরুর চরণ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—বলিলেন "পিতা, আমি কিছুই জানিনা, আমি কিছুই বুঝিতে পারিনা—আমি কোথায় যাইতেছি দেখিতে পাইতেছি না!"

রঘুপতি জয়সিংহের হাত ধরিয়া বলিলেন—"বৎস, আমি তোমাকে তোমার শৈশব হইতে মাতার ন্যায় স্নেহে পালন করিয়াছি, পিতার ন্যায় যত্নে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছি—তোমার

প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সখার ন্যায় তোমাকে আমার সমুদায় মন্ত্রণার সহযোগী করিয়াছি। আজ তোমাকে কে আমার পাশ হইতে টানিয়া লইতেছে, এতদিনকার স্নেহ মমতার বন্ধন কে বিচ্ছিন্ন করিতেছে? তোমার উপর যে আমার দেবদত্ত অধিকার জন্মিয়াছে সেই পবিত্র অধিকারে কে হস্তক্ষেপ করিয়াছে? বল, বৎস, সেই মহাপাতকীর নাম বল।"

জয়সিং বলিলেন—"প্রভু, আপনার কাছ হইতে আমাকে কেহ বিচ্ছিন্ন করে নাই—আপনিই আমাকে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমি ছিলাম গৃহের মধ্যে, আপনি সহসা পথের মধ্যে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছেন। আপনি বলিয়াছেন কেই বা পিতা, কেই বা মাতা, কেই বা ভ্রাতা! আপনি বলিয়াছেন পৃথিবীতে কোন বন্ধন নাই, স্নেহ প্রেমের পবিত্র অধিকার নাই। যাঁহাকে মা বলিয়া জানিতাম আপনি তাঁহাকে বলিয়াছেন শক্তি। যে যেখানে হিংসা করিতেছে, যে যেখানে রক্তপাত করিতেছে, যেখানেই ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ, যেখানেই দুই জন মানুষে যুদ্ধ, সেইখানেই এই তৃষিত শক্তি রক্তলালসায় তাঁহার খর্পর লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন! আপনি মায়ের কোল হইতে আমাকে এ কি রাক্ষসের দেশে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছেন!"

রঘুপতি অনেকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "তবে তুমি স্বাধীন হইলে, বন্ধন মুক্ত হইলে, তোমার উপর হইতে আমার সমস্ত অধিকার আমি প্রত্যাহরণ করিলাম, তাহাতেই যদি তুমি সুখী হও, তবে তাই হউক!" বলিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

জয়সিং তাঁহার পা ধরিয়া বলিলেন "না না না প্রভু—আপনি আমাকে ত্যাগ করিলেও আমি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারি না। আমি রহিলাম—আপনার পদতলেই রহিলাম, আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন। আপনার পথছাড়া আমার আর অন্য পথ নাই।"

রঘুপতি তখন জয়সিংকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন—তাঁহার অশ্রু প্রবাহিত হইয়া জয়সিংহের স্কন্ধে পড়িতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

মন্দিরে অনেক লোক জমা হইয়াছে। খুব কোলাহল উঠিতেছে। রঘুপতি রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি করিতে আসিয়াছ!"

তাহারা নানা কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আমরা ঠাকরুণ দর্শন করিতে আসিয়াছি!"

রঘুপতি বলিয়া উঠিলেন "ঠাকরুণ কোথায়! ঠাকরুণ এ রাজ্য থেকে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুণকে রাখতে পার্‌লি কৈ? তিনি চলে গেছেন।"

ভারি গোলমাল উঠিল—নানাদিক হইতে নানা কথা শুনা যাইতে লাগিল—"সে কি কথা ঠাকুর!" "আমরা কি অপরাধ করেছি ঠাকুর!" "মা কি কিছুতেই প্রসন্ন হবেন

না!" "আমার ভাইপোর ব্যাম ছিল বলে আমি ক'দিন পূজা দিতে আসিনি!" (তার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারই উপেক্ষা সহিতে না পারিয়া দেবী দেশ ছাড়িতেছেন।) "আমার পাঁঠা দুটি ঠাকরুণকে দেব মনে করেছিলুম, বিস্তর দূর ব'লে আস্‌তে পারিনি!" (দুটো পাঁঠা দিতে দেরী করিয়া রাজ্যের যে এরূপ অমঙ্গল ঘটিল, ইহাই মনে করিয়া সে কাতর হইতে ছিল।) "গোবর্দ্ধন যা মানুষ করেছিল তা' মাকে দেয়নি বটে কিন্তু মাও তেমনি তা'কে শাস্তি দিয়েছেন। তার পিলে বেড়ে ঢাক হয়েছে, সে আজ ছমাস বিছানায় প'ড়ে!" (গোবর্দ্ধন তাহার প্লীহার আতিশয্য লইয়া চুলায় যাক্, মা দেশে থাকুন্ এই রূপ সে মনে মনে প্রার্থনা করিল। সকলেই অভাগা গোবর্দ্ধনের প্লীহার প্রচুর উন্নতি কামনা করিতে লাগিল।) ভিড়ের মধ্যে একটি দীর্ঘপ্রস্থ লোক ছিল সে সকলকে ধমক দিয়া থামাইল, এবং রঘুপতিকে যোড়হস্তে কহিল "ঠাকুর, মা কেন চলিয়া গেলেন, আমাদের কি অপরাধ হইয়াছিল!"

রঘুপতি কহিলেন "তোরা মায়ের জন্য একফোঁটা রক্ত দিতে পারিস্‌নে, এই ত তোদের ভক্তি!"

সকলে চুপ করিয়া রহিল। অবশেষে কথা উঠিতে লাগিল। অস্পষ্ট স্বরে কেহ কেহ বলিতে লাগিল—"রাজার নিষেধ, আমরা কি করিব!"

জয়সিং প্রস্তরের পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া বসিয়াছিলেন। "মায়ের নিষেধ" এই কথা তড়িদ্বেগে তাঁহার রসনাগ্রে উঠিয়াছিল—কিন্তু তিনি আপনাকে দমন করিলেন—একটি কথা কহিলেন না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"রাজা! রাজা কে! মায়ের সিংহাসন কি রাজার সিংহাসনের নীচে! তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে লইয়াই তোরা থাক্! দেখি তোদের কে রক্ষা করে!"

জনতার মধ্যে গুন্ গুন্ শব্দ উঠিল। সকলেই সাবধানে কথা কহিতে লাগিল।

রঘুপতি দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন "রাজাকেই বড় করিয়া লইয়া তোদের মাকে তোরা রাজ্য হইতে অপমান করিয়া বিদায় করিলি! সুখে থাকিবি মনে করিস্‌নে! আজ তিন-বৎসর পরে এতবড় রাজ্যে তোদের ভিটের চিহ্ন থাকিবেনা—তোদের বংশে বাতী দিবার কেহ থাকিবে না!"

জনতার মধ্যে সাগরের গুন্ গুন্ শব্দ ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল। জনতাও ক্রমে বাড়িতেছে। সেই দীর্ঘলোকটি যোড়হাত করিয়া রঘুপতিকে কহিল—"সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে তবে মা তাকে শাস্তি দিন—কিন্তু মা সন্তানকে একেবারে পরিত্যাগ করে যাবেন এ কি কখন হয়! প্রভু ব'লে দি'ন কি কর্‌লে মা ফিরে আস্‌বেন।"

রঘুপতি কহিলেন "তোদের এই রাজা যখন এ রাজ্য হইতে বাহির হইয়া যাইবেন মাও তখন এই রাজ্যে পুনর্ব্বার পদার্পণ করবেন।"

এই কথা শুনিয়া জনতার গুন্ গুন্ শব্দ হঠাৎ থামিয়া গেল। হঠাৎ চতুর্দ্দিক সুগভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল, অবশেষে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিল; কেহ সাহস করিয়া কথা কহিতে পারিল না।

রঘুপতি মেঘগম্ভীরস্বরে কহিলেন "তবে তোরা দেখিবি! আয়, আমার সঙ্গে আয়! অনেক দূর হ'তে অনেক আশা করিয়া তোরা ঠাকুরুণকে দর্শন করিতে আসিয়াছিস্—চল্ একবার মন্দিরে চল্!"

সকলে সভয়ে মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গনে আসিয়া সমবেত হইল। মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ ছিল—রঘুপতি ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দিলেন।

কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। প্রতিমার মুখ দেখা যাইতেছে না, প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দর্শকের দিকে স্থাপিত!—মা বিমুখ হইয়াছেন! সহসা জনতার মধ্য হইতে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল "একবার ফিরিয়া দাঁড়াও মা! আমরা কি অপরাধ করিয়াছি!" চারিদিকে "মা কোথায়, মা কোথায়' রব উঠিল। প্রতিমা পাষাণ বলিয়াই ফিরিল না। অনেকে মূর্চ্ছা গেল। ছেলেরা কিছু না বুঝিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধেরা মাতৃহারা শিশুসন্তানের মত ডাকিতে লাগিল "মা—ওমা!" স্ত্রীলোকদের ঘোমটা খুলিয়া গেল, অঞ্চল খসিয়া পড়িল—তাহারা বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিল। যুবকেরা কম্পিত উর্দ্ধস্বরে বলিতে লাগিল "মা তোকে আমরা ফিরিয়ে আন্‌ব—তোকে আমরা ছাড়্‌ব না!" এক জন পাগল গাহিয়া উঠিল—

"মা আমার পাষাণের মেয়ে,
সন্তানে দেখ্‌লিনে চেয়ে!"

মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া সমস্ত রাজ্য যেন মা মা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল—কিন্তু প্রতিমা ফিরিল না। মধ্যাহ্নের সূর্য্য প্রখর হইয়া উঠিল—প্রাঙ্গনে উপবাসী জনতার বিলাপ থামিল না।

তখন জয়সিং কম্পিত পদে আসিয়া রঘুপতিকে কহিলেন—"প্রভু, আমি কি একটি কথাও কহিতে পাইব না!"

রঘুপতি ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া কহিলেন—"না, একটি কথাও না।'

জয়সিংহ কহিলেন "সন্দেহের কি কোন কারণ নাই!"

রঘুপতি দৃঢ়স্বরে কহিলেন "না!"

জয়সিং দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া কহিলেন "সমস্তই কি বিশ্বাস করিব!"

রঘুপতি জয়সিংহকে সুতীব্র দৃষ্টিদ্বারা দগ্ধ করিয়া কহিলেন "হাঁ!"

জয়সিংহ বক্ষে হাত দিয়া কহিলেন—"আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!" তিনি জনতার মধ্য হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন ২৯শে আষাঢ়। আজ রাত্রে চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা। আজ প্রভাতে তালবনের আড়ালে সূর্য্য যখন উঠিতেছেন, তখন পূর্ব্বদিকে মেঘ নাই। কনক কিরণ-প্লাবিত আনন্দময় কাননের মধ্যে গিয়া জয়সিং যখন বসিলেন তখন তাঁহার পুরাতন স্মৃতি সকল মনে উঠিতে লাগিল। এই বনের মধ্যে এই পাষাণ মন্দিরের পাষাণ সোপানাবলীর মধ্যে, এই গোমতী তীরে সেই বৃহৎ বটের ছায়ায়, সেই ছায়া দিয়া ঘেরা পুকুরের ধারে তাঁহার বাল্যকাল সুমধুর স্বপ্নের মত মনে পড়িতে লাগিল। যে সকল মধুর দৃশ্য তাঁহার বাল্যকালকে সস্নেহে ঘিরিয়া থাকিত, তাহারা আজ হাসিতেছে, তাঁহাকে আবার আহ্বান করিতেছে, কিন্তু তাঁহার মন বলিতেছে "আমি যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি, আমি বিদায় লইয়াছি, আমি আর ফিরিব না!" শ্বেত পাষাণের মন্দিরের উপরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়াছে এবং তাহার বামদিকের ভিত্তিতে কম্পিত বকুলশাখায় কম্পিত ছায়া পড়িয়াছে। ছেলে-বেলায় এই পাষাণমন্দিরকে যেমন সচেতন বোধ হইত—এই সোপানের মধ্যে একলা বসিয়া যখন খেলা করিতেন তখন এই সোপানগুলির মধ্যে যেমন সঙ্গ পাইতেন, আজ প্রভাতের সূর্য্যকিরণে মন্দিরকে তেমনি সচেতন, তাহার সোপানগুলিকে তেমনি শৈশবের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। মন্দিরের ভিতরে মাকে আজ আবার মা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কিন্তু অভিমানে তাঁহার হৃদয় পূরিয়া গেল, তাঁহার দুইচক্ষু ভাসিয়া জল পড়িতে লাগিল।

রঘুপতিকে আসিতে দেখিয়া জয়সিং চোখের জল মুছিয়া ফেলিলেন। গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন—"আজ পূজার দিন। মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া কি শপথ করিয়াছিলে মনে আছে?"

জয়সিং কহিলেন—"আছে।"

রঘুপতি—"শপথ পালন করিবে ত!"

জয়সিং—"হাঁ।"

রঘুপতি "দেখিও বৎস, সাবধানে কাজ করিও। বিপদের আশঙ্কা আছে। আমি তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই প্রজাদিগকে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছি।"

জয়সিং চুপ করিয়া রঘুপতির মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন কিছুই উত্তর করিলেন না। রঘুপতি তাঁহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "আমার আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে তুমি তোমার কার্য্য-সাধন করিতে পারিবে, মায়ের আদেশ পালন করিতে পারিবে!" এই বলিয়া চলিয়া গেলেন।

অপরাহ্নে একটি ঘরে বসিয়া রাজা ধ্রুবের সহিত খেলা করিতেছেন। ধ্রুবের আদেশ-মতে একবার মাথায় মুকুট দিতেছেন, একবার মাথা হইতে মুকুট খুলিতেছেন—ধ্রুব

মহারাজের এই দুর্দশা দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেছে। রাজা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "আমি অভ্যাস করিতেছি। তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেমন সহজে পরিতে পারিয়াছি, তাঁহার আদেশে এ মুকুট যেন তেম্‌নি সহজে খুলিতে পারি। মুকুট পরা শক্ত কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।"

ধ্রুবের মনে সহসা একটা ভাবোদয় হইল—কিয়ৎক্ষণ রাজার মুখের দিকে চাহিয়া মুখে আঙ্গুল দিয়া বলিল—"তুমি আজা!" "রাজা" শব্দ হইতে "র" অক্ষর একেবারে সমূলে লোপ করিয়া দিয়াও ধ্রুবের মনে কিছুমাত্র অনুতাপের উদয় হইল না। রাজার মুখের সাম্‌নে রাজাকে আজা বলিয়া সে সম্পূর্ণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিল।

রাজা ধ্রুবের এই ধৃষ্টতা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিলেন "তুমি আজা।"

ধ্রুব বলিল—"তুমি আজা!"

এ বিষয়ে তর্কের শেষ হইল না। কোন পক্ষে কোন প্রমাণ নাই, তর্ক কেবলই গায়ের জোরে! অবশেষে রাজা নিজের মুকুট লইয়া ধ্রুবের মাথায় চড়াইয়া দিলেন। তখন ধ্রুবের আর কথাটি কহিবার যো রহিল না, তাহার সম্পূর্ণ হার হইল। ধ্রুবের মুখের আধখানা সেই মুকুটের নীচে ডুবিয়া গেল। মুকুট সমেত মস্ত মাথা দুলাইয়া ধ্রুব মুকুটহীন রাজার প্রতি আদেশ করিল—"এক্‌টা গল্প বল।"

রাজা বলিলেন "কি গল্প বলিব?"

ধ্রুব কহিল "দিদির গল্প বল।" গল্পমাত্রকেই ধ্রুব দিদির গল্প বলিয়া জানিত। সে জানিত দিদি তাহাকে যে সকল গল্প করিত তাহা ছাড়া পৃথিবীতে আর গল্প নাই।

রাজা তখন মস্ত এক পৌরাণিক গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "হিরণ্য কশিপু নামে এক আজা ছিল।"

আজা শুনিয়া ধ্রুব বলিয়া উঠিল "আমি আজা!" মস্ত টিলে মুকুটের জোরে হিরণ্যকশিপুর রাজপদ সে একেবারে অগ্রাহ্য করিল।

চাটুভাষী সভাসদের ন্যায় গোবিন্দমাণিক্য সেই কিরীটি শিশুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বলিলেন "তুমিও আজা সেও আজা।"

ধ্রুব তাহাতেও সুস্পষ্ট অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিল "না, আমি আজা!"

অবশেষে মহারাজ যখন বলিলেন "হিরণ্য কশিপু আজা নয় সে আক্কস্ (রাক্ষস)" তখন ধ্রুব তাহাতে আপত্তি করিবার কিছুই দেখিল না।

এমন সময়ে নক্ষত্রমাণিক্য গৃহে প্রবেশ করিলেন—কহিলেন "শুনিলাম, রাজকার্য্যোপলক্ষে মহারাজ আমাকে ডাকিয়াছেন। আদেশের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি।"

রাজা কহিলেন "আরেকটু অপেক্ষা কর, গল্পটা শেষ করিয়া লই।" বলিয়া গল্পটা সমস্ত শেষ করিলেন। "আক্কস্ দুষ্টু।" গল্প শুনিয়া সংক্ষেপে ধ্রুব এইরূপ মত প্রকাশ করিল।

ধ্রুবের মাথায় মুকুট দেখিয়া নক্ষত্ররায়ের ভাল লাগে নাই। ধ্রুব যখন দেখিল নক্ষত্র-রায়ের দৃষ্টি তাহার দিকে স্থাপিত রহিয়াছে, তখন সে নক্ষত্ররায়কে গম্ভীরভাবে জানাইয়া দিল "আমি রাজা!"

নক্ষত্র বলিলেন "ছি, ও কথা বলিতে নাই" বলিয়া ধ্রুবের মাথা হইতে মুকুট তুলিয়া লইয়া রাজার হাতে দিতে উদ্যত হইলেন। ধ্রুব মুকুটহরণের সম্ভাবনা দেখিয়া সত্যকার রাজাদের মত চীৎকার করিয়া উঠিল। গোবিন্দমাণিক্য তাহাকে এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, নক্ষত্রকে নিবারণ করিলেন।

অবশেষে গোবিন্দমাণিক্য নক্ষত্ররায়কে কহিলেন—"শুনিয়াছি, রঘুপতি ঠাকুর অসৎ উপায়ে প্রজাদের অসন্তোষ উদ্রেক করিয়া দিতেছেন। তুমি স্বয়ং নগরের মধ্যে গিয়া এ বিষয়ে তদারক করিয়া আসিবে এবং সত্য মিথ্যা অবধারণ করিয়া আমাকে জানাইবে।"

নক্ষত্ররায় কহিলেন "যে আজ্ঞে!" বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু ধ্রুবের মাথায় মুকুট তাঁহার কিছুতেই ভাল লাগিল না।

প্রহরী আসিয়া কহিল "পুরোহিত ঠাকুরের সেবক জয়সিং সাক্ষাৎ প্রার্থনায় দ্বারে দাঁড়াইয়া।"

রাজা তাহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন।

জয়সিং মহারাজকে প্রণাম করিয়া করযোড়ে কহিলেন "মহারাজ, আমি বহু দূরদেশে চলিয়া যাইতেছি। আপনি আমার রাজা, আমার পিতা, আমার গুরু, আপনার আশী-র্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় যাইবে জয়সিং?"

জয়সিং কহিলেন "জানিনা মহারাজ, কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না!" রাজাকে কথা কহিতে উদ্যত দেখিয়া জয়সিং কহিলেন "নিষেধ করিবেন না মহারাজ! আপনি নিষেধ করিলে আমার যাত্রা শুভ হইবে না। আশীর্ব্বাদ করুন এখানে আমার যে সকল সংশয় ছিল সেখানে যেন সে সকল সংশয় দূর হইয়া যায়। এখানকার মেঘ সেখানে যেন কাটিয়া যায়! যেন আপনার মত রাজার রাজত্বে যাই, যেন শান্তি পাই!"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কবে যাইবে?"

জয়সিং কহিলেন "আজ সন্ধ্যাকালে। অধিক সময় নাই মহারাজ, আজ আমি তবে বিদায় হই।" বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া রাজার পদধূলি লইলেন, রাজার চরণে দুইফোঁটা অশ্রুজল পড়িল।

জয়সিং উঠিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ধ্রুব ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার কাপড় টানিয়া কহিল "তুমি যেওনা!"

জয়সিং হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন "কার কাছে থাকিব বৎস? আমার কে আছে?"

ধ্রুব কহিল "আমি আজা!"

জয়সিং কহিলেন "তোমরা রাজার রাজা, তোমরাই সকলকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ!" ধ্রুবকে কোল হইতে নামাইয়া জয়সিংহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মহারাজ গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশী তিথি। মেঘও করিয়াছে চাঁদও উঠিয়াছে। আকাশের কোথাও আলো কোথাও অন্ধকার। কখনও চাঁদ বাহির হইতেছে, কখনও চাঁদ লুকাইতেছে। অন্ধকারের রহস্য ভেদ করিবার জন্য আলোক অনেক চেষ্টা করিতেছে, অবশেষে হতাশ হইয়া বিষণ্ণ মুখে রহস্যের মধ্যে আপনি মিলিয়া যাইতেছে। গোমতী তীরের অরণ্যগুলি চাঁদের দিকে চাহিয়া তাহাদের গভীর অন্ধকার রাশির মর্ম্মভেদ করিয়া মাঝে মাঝে নিশ্বাস ফেলিতেছে।

আজ রাত্রে পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। রাত্রে পথে লোক কেই বা বাহির হয়! কিন্তু নিষেধ আছে বলিয়া পথের বিজনতা আজ আরও গভীরতর বোধ হইতেছে। নগরবাসীরা সকলেই আপনাপন ঘরের দীপ নিভাইয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। পথে একটি প্রহরী নাই। চোরও আজ পথে বাহির হয় না। যাহারা শ্মশানে শবদাহ করিতে যাইবে তাহারা মৃতদেহ ঘরে লইয়া প্রভাতের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে। ঘরে যাহাদের সন্তান মুমূর্ষু তাহারা বৈদ্য ডাকিতে বাহির হয় না। যে ভিক্ষুক পথপ্রান্তে বৃক্ষতলে শয়ন করিত সে আজ গৃহস্থের গোশালায় আশ্রয় লইয়াছে।

সে রাত্রে শৃগাল কুকুর নগরের পথে পথে বিচরণ করিতেছে, দুই একটা চিতাবাঘ গৃহস্থের দ্বারের কাছে আসিয়া উঁকি মারিতেছে। মানুষের মধ্যে কেবল একজন মাত্র আজ গৃহের বাহিরে আছে—আর মানুষ নাই। সে একখানা ছুরি লইয়া নদীতীরে পাথরের উপরে শান দিতেছে, এবং অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছে। ছুরিতে ধার যথেষ্ট ছিল, কিন্তু সে বোধকরি ছুরির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাতেও শান দিতেছিল, তাই তার শান-দেওয়া আর শেষ হইতেছিল না। প্রস্তরের ঘর্ষণে তীক্ষ্ণ ছুরি হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া হিংসার লালসায় তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকার নদী বহিয়া যাইতেছিল। জগতের উপর দিয়া অন্ধকার রজনীর প্রহর বহিয়া যাইতেছিল। মাথায় আকাশের উপর দিয়া অন্ধকার ঘন মেঘের স্রোত ভাসিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে যখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, তখন জয়সিংহের চেতনা হইল। তপ্ত ছুরি খাপের মধ্যে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। পূজার সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তাঁহার শপথের কথা মনে পড়িয়াছে। আর একদণ্ডও বিলম্ব করিলে চলিবে না।

মন্দির আজ সহস্র দীপে আলোকিত। ত্রয়োদশ দেবতার মাঝখানে কালী দাঁড়াইয়া নররক্তের জন্য জিহ্বা মেলিয়াছেন। মন্দিরের সেবকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া, চতু-

দ্দশ দেবপ্রতিমা সম্মুখে করিয়া রঘুপতি একাকী মন্দিরে বসিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘ খাঁড়া। উলঙ্গ উজ্জ্বল খড়্গ দীপালোকে বিভাসিত হইয়া স্থির বজ্রের ন্যায় দেবীর আদেশের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

অর্দ্ধরাত্রে পূজা। সময় নিকটবর্ত্তী। রঘুপতি অত্যন্ত অস্থির চিত্তে জয়সিংহের জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন। সহসা ঝড়ের মত বাতাস উঠিয়া মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। বাতাসে মন্দিরের সহস্র দীপশিখা কাঁপিতে লাগিল, উলঙ্গ খড়্গের উপর বিদ্যুত খেলিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবতা এবং রঘুপতির ছায়া যেন জীবন পাইয়া দীপশিখার নৃত্যের তালে তালে মন্দিরের ভিত্তিময় নাচিতে লাগিল। একটা নর-কপাল ঝড়ের বাতাসে ঘরময় গড়াইতে লাগিল। মন্দিরের মধ্যে দুইটা চামচিকা আসিয়া শুষ্ক-পত্রের মত ক্রমাগত উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল—দেয়ালে তাহাদের ছায়া উড়িতে লাগিল।

দ্বিপ্রহর হইল। প্রথমে নিকটে পরে দূর দূরান্তরে শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। ঝড়ের বাতাসও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিল। পূজার সময় হইয়াছে। রঘুপতি অমঙ্গল আশঙ্কায় অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন।

এমন সময়ে জীবন্ত ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মত জয়সিং নিশীথের অন্ধকারের মধ্যে হইতে সহসা মন্দিরের আলোকের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ চাদরে দেহ আচ্ছাদিত, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া বৃষ্টিধারা পড়িতেছে, নিশ্বাস বেগে বহিতেছে, চক্ষুতারকায় অগ্নিকণা জ্বলিতেছে।

রঘুপতি তাঁহাকে ধরিয়া কানের কাছে মুখ দিয়া কহিলেন "রাজরক্ত আনিয়াছ!"

জয়সিং তাঁহার হাত ছাড়াইয়া উচ্চস্বরে কহিলেন "আনিয়াছি! রাজরক্ত আনিয়াছি! আপনি সরিয়া দাঁড়ান্, আমি দেবীকে নিবেদন করি!" শব্দে মন্দির কাঁপিয়া উঠিল।

কালীর প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"সত্যই কি তবে তুই সন্তানের রক্ত চাস্ মা! রাজরক্ত নহিলে তোর তৃষা মিটিবে না! জন্মাবধি আমি তোকেই মা বলিয়া আসিয়াছি, আমি তোরই সেবা করিয়াছি, আমি আর কাহারও দিকে চাই নাই, আমার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আমি রাজপুত, আমি ক্ষত্রিয়, আমার প্রপিতামহ রাজা ছিলেন, আমার মাতামহ বংশীয়েরা আজও রাজত্ব করিতেছেন। এইনে তবে তোর সন্তানের রক্ত, তোর রাজরক্ত এই নে!" গাত্র হইতে চাদর পড়িয়া গেল। কটিবন্ধ হইতে ছুরি বাহির করিলেন—বিদ্যুৎ নাচিয়া উঠিল—চকিতের মধ্যে সেই ছুরি আমূল তাঁহার হৃদয়ে নিহিত করিলেন, মরণের তীক্ষ্ণ জিহ্বা তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। প্রতিমার পদতলে পড়িয়া গেলেন; পাষাণ-প্রতিমা বিচলিত হইল না।

রঘুপতি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—জয়সিংকে তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না। তাঁহার মৃতদেহের উপর পড়িয়া রহিলেন। রক্ত গড়াইয়া মন্দিরের শ্বেত প্রস্তরের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল। ক্রমে দীপগুলি একে একে নিবিয়া গেল। অন্ধ-

কারের মধ্যে সমস্ত রাত্রি একটি প্রাণীর নিশ্বাসের শব্দ শুনা গেল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ঝড় থামিয়া চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল। রাত্রি চতুর্থ প্রহরের সময় মেঘের ছিদ্র দিয়া চন্দ্রালোক মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। চন্দ্রালোক জয়সিংহের পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর পড়িল। চতুর্দ্দশ দেবতা শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল। প্রভাতে বন হইতে যখন পাখী ডাকিয়া উঠিল তখন রঘুপতি মৃতদেহ ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাজার আদেশমত প্রজাদের অসন্তোষের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নক্ষত্ররায় স্বয়ং প্রাতঃকালে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার ভাবনা হইতে লাগিল, মন্দিরে কি করিয়া যাই! রঘুপতির সম্মুখে পড়িলে তিনি কেমন অস্থির হইয়া পড়েন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন না। রঘুপতির সম্মুখে পড়িতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা। এই জন্য তিনি স্থির করিয়াছেন, রঘুপতির দৃষ্টি এড়াইয়া গোপনে জয়সিংহের কক্ষে গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারিবেন।

নক্ষত্ররায় ধীরে ধীরে জয়সিংহের কক্ষে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই মনে করিলেন, ফিরিতে পারিলে বাঁচি। দেখিলেন, জয়সিংহের পুঁথি, তাঁহার বসন, তাঁহার গৃহসজ্জা চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে, মাঝখানে রঘুপতি বসিয়া। জয়সিংহ নাই। রঘুপতির লোহিত চক্ষু অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছে, তাঁহার কেশপাশ বিশৃঙ্খল। তিনি নক্ষত্র রায়কে দেখিয়াই দৃঢ়মুষ্টিতে তাঁহার হাত ধরিলেন। বলপূর্ব্বক তাঁহাকে মাটিতে বসাইলেন নক্ষত্ররায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল। রঘুপতি তাঁহার অঙ্গার নয়নে নক্ষত্র রায়ের মর্ম্মস্থান পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া পাগলের মত বলিলেন "রক্ত কোথায়!" নক্ষত্র রায়ের হৃৎপিণ্ডে রক্তের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, মুখ দিয়া কথা সরিল না।

রঘুপতি উচ্চস্বরে বলিলেন "তোমার প্রতিজ্ঞা কোথায়! রক্ত কোথায়!"

নক্ষত্র রায় হাত নাড়িলেন, পা নাড়িলেন, বামে সরিয়া বসিলেন, কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, তাঁহার ঘর্ম্ম বহিতে লাগিল, তিনি শুষ্কমুখে বলিলেন—"ঠাকুর—"

রঘুপতি কহিলেন—"এবার মা যে স্বয়ং খড়্গ তুলিয়াছেন—এবার চারিদিকে যে রক্তের স্রোত বহিতে থাকিবে—এবার তোমাদের বংশে এক ফোঁটা রক্ত যে বাকী থাকিবে না। তখন দেখিব নক্ষত্ররায়ের ভ্রাতৃস্নেহ!"

"ভ্রাতৃস্নেহ! হাঃ হাঃ হাঃ!—ঠাকুর"—নক্ষত্ররায়ের হাসি আর বাহির হইল না—গলা শুকাইয়া গেল।

রঘুপতি কহিলেন—"আমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত চাইনা। পৃথিবীতে গোবিন্দমাণিক্যের যে প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় আমি তাহাকেই চাই! তাহার রক্ত লইয়া আমি

গোবিন্দমাণিক্যের গায়ে মাখাইতে চাই—তাহার হৃদয় রক্তবর্ণ হইয়া যাইবে—সে রক্তের চিহ্ন কিছুতেই মুছিবে না! এই দেখ—চাহিয়া দেখ!" বলিয়া উত্তরীয় মোচন করিলেন, তাঁহার দেহ রক্তে লিপ্ত, তাঁহার বক্ষদেশে স্থানে স্থানে রক্ত জমিয়া আছে।

নক্ষত্ররায় শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার হাত পা কাঁপিতে লাগিল।

রঘুপতি বজ্রমুষ্টিতে নক্ষত্র রায়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—"সে কে? কে গোবিন্দমাণিক্যের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়? কে চলিয়া গেলে গোবিন্দমাণিক্যের চক্ষে পৃথিবী শ্মশান হইয়া যাইবে, তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য চলিয়া যাইবে? সকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই কাহার মুখ তাঁহার মনে পড়ে, কাহার স্মৃতি সঙ্গে করিয়া তিনি রাত্রে শয়ন করিতে যান, তাঁহার হৃদয়ের নীড় সমস্তটা পরিপূর্ণ করিয়া কে বিরাজ করিতেছে! সে কে? সে কি তুমি?" বলিয়া, ব্যাঘ্র লম্ফ দিবার পূর্ব্বে কম্পিত হরিণ-শিশুর দিকে যেমন এক দৃষ্টিতে চায়, রঘুপতি তেমনি নক্ষত্রের দিকে চাহিলেন।

নক্ষত্ররায় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—"না, আমি না!" কিন্তু কিছুতেই রঘুপতির মুষ্টি ছাড়াইতে পারিলেন না।

রঘুপতি বলিলেন—"তবে, বল সে কে?"

নক্ষত্ররায় বলিয়া ফেলিলেন—"সে ধ্রুব!"

রঘুপতি বলিলেন—"ধ্রুব কে?"

নক্ষত্ররায়—"সে একটি শিশু—"

রঘুপতি বলিলেন—"আমি জানি, তাহাকে জানি! রাজার নিজের সন্তান নাই, তাহাকেই সন্তানের মত পালন করিতেছেন। নিজের সন্তানকে লোকে কেমন ভাল-বাসে জানিনা, কিন্তু পালিত সন্তানকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসে তাহা জানি। আপনার সমুদয় সম্পদের চেয়ে তাহার সুখ রাজার বেশী মনে হয়। আপনার মাথায় মুকুটের চেয়ে তাহার মাথায় মুকুট দেখিলে রাজার বেশী আনন্দ হয়।"

নক্ষত্র রায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক কথা!"

রঘুপতি কহিলেন—"ঠিক কথা নয় ত কি? রাজা তাহাকে কতখানি ভালবাসেন তাহা কি আমি জানি না? আমি কি বুঝিতে পারি না? আমি ত তাহাকেই চাই।"

নক্ষত্ররায় হাঁ করিয়া রঘুপতির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আপন মনে বলিলেন "তাহাকেই চাই।"

রঘুপতি কহিলেন—"তাহাকে আনিতেই হইবে—আজই আনিতে হইবে—আজ রাত্রেই চাই।" নক্ষত্ররায় প্রতিধ্বনির মত কহিলেন "আজরাত্রেই চাই।"

নক্ষত্র রায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া গলার স্বর নামাইয়া রঘুপতি বলিলেন—"এই শিশুই তোমার শত্রু, তাহা জান? তুমি রাজবংশে জন্মিয়াছ—কোথাকার এক অজ্ঞাতকুলশীল শিশু তোমার মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে তাহা

স্থান? যে সিংহাসন তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সেই সিংহাসনে তাহার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা কি দুটো চক্ষু থাকিতে দেখিতে পাইতেছ না?”

নক্ষত্ররায়ের কাছে এ সকল কথা নূতন নহে। তিনিও পূর্ব্বে এইরূপ ভাবিয়াছিলেন। সগর্ব্বে বলিলেন “তা' কি আর বলিতে হইবে ঠাকুর? আমি কি আর এইটে দেখিতে পাই না!”

রঘুপতি কহিলেন—“তবে আর কি! তবে তাহাকে আনিয়া দাও। তোমার সিংহাসনের বাধা দূর করি! এই ক'টা প্রহর কোন মতে কাটিবে, তারপরে—তুমি কখন আনিবে!”

নক্ষত্র রায়—“আজ সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার হইলে।”

পৈতা স্পর্শ করিয়া রঘুপতি বলিলেন—“যদি না আনিতে পার ত ব্রাহ্মণের অভিশাপ লাগিবে। তা হইলে, যে মুখে তুমি প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিয়া পালন না কর, ত্রিরাত্রি না পোহাইতে সেই মুখের মাংস শকুনিতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে!”

শুনিয়া নক্ষত্ররায় চমকিয়া মুখে হাত বুলাইলেন—কোমল মাংসের উপরে শকুনির চঞ্চুপাত কল্পনা তাঁহার নিতান্ত দুঃসহ বোধ হইল। রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় হইলেন। সে ঘর হইতে আলোক বাতাস ও জন কোলাহলের মধ্যে গিয়া নক্ষত্ররায় পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন সন্ধ্যাবেলায় নক্ষত্ররায়কে দেখিয়া ধ্রুব “কাকা” বলিয়া ছুটিয়া আসিল, দুটি ছোট হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া তাঁহার কপোলে কপোল দিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিল। চুপি চুপি বলিল “কাকা।”

নক্ষত্র কহিলেন—“ছি, ও কথা বোলো না, আমি তোমার কাকা না।”

ধ্রুব তাঁহাকে এতকাল বরাবর কাকা বলিয়া আসিতেছিল, আজ সহসা বারণ শুনিয়া সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া গেল। গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—তার পরে নক্ষত্রের মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“তুমি কে?”

নক্ষত্র রায় কহিলেন “আমি তোমার কাকা নই।”

শুনিয়া সহসা ধ্রুবের অত্যন্ত হাসি পাইল—এত বড় অসম্ভব কথা সে ইতিপূর্ব্বে আর কখনই শুনে নাই—সে হাসিয়া বলিল “তুমি কাকা!” নক্ষত্র যত নিষেধ করিতে লাগিলেন, সে ততই বলিতে লাগিল “তুমি কাকা।” তাহার হাসিও তত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে নক্ষত্র রায়কে কাকা বলিয়া ক্ষেপাইতে লাগিল। নক্ষত্র বলিলেন “ধ্রুব, তোমার দিদিকে দেখিতে যাইবে?”

ধ্রুব তাড়াতাড়ি নক্ষত্রের গলা ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল “দিদি কোথায়?”

নক্ষত্র বলিলেন "মায়ের কাছে।"

ধ্রুব কহিল—"মা কোথায় ?"

নক্ষত্র—"মা আছেন এক জায়গায়। আমি সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।"

ধ্রুব হাততালি দিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কখন্ নিয়ে যাবে কাকা ?"

নক্ষত্র—"এখনি।"

ধ্রুব আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিয়া সজোরে নক্ষত্রের গলা জড়াইয়া ধরিল। নক্ষত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চাদরে আচ্ছাদন করিয়া গুপ্ত দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

আজ রাত্রেও পথে লোক বাহির হওয়া নিষেধ। এই জন্য পথে প্রহরী নাই, পথিক নাই। আকাশে পূর্ণচন্দ্র।

মন্দিরে গিয়া নক্ষত্র রায় ধ্রুবকে রঘুপতির হাতে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। রঘুপতিকে দেখিয়া ধ্রুব সবলে নক্ষত্র রায়কে জড়াইয়া ধরিল কোন মতে ছাড়িতে চাহিল না। রঘুপতি তাহাকে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইলেন। ধ্রুব "কাকা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্র রায়ের চখে জল আসিল—কিন্তু রঘুপতির কাছে এই হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইতে তাঁহার নিতান্ত লজ্জা করিতে লাগিল। তিনি ভাণ করিলেন যেন তিনি পাষাণে গঠিত। তখন ধ্রুব কাঁদিয়া কাঁদিয়া "দিদি" "দিদি" বলিয়া ডাকিতে লাগিল, দিদি আসিল না। রঘুপতি বজ্রস্বরে এক ধমক দিয়া উঠিলেন। ভয়ে ধ্রুবের কান্না থামিয়া গেল। কেবল তাহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার কান্না ফাটিয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দেবমূর্ত্তি চাহিয়া রহিল।

গোবিন্দমাণিক্য নিশীথে স্বপ্নে ক্রন্দন শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। সহসা শুনিতে পাইলেন, তাঁহার বাতায়নের নীচে হইতে কে কাতর স্বরে ডাকিতেছে "মহারাজ—মহারাজ!"

রাজা সত্বর উঠিয়া গিয়া চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলেন—ধ্রুবের পিতৃব্য কেদারেশ্বর। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে!"

কেদারেশ্বর কহিলেন—"মহারাজ, আমার ধ্রুব কোথায় ?"

রাজা কহিলেন—"কেন, তাহার শয্যাতে নাই!"

"না।"

কেদারেশ্বর বলিতে লাগিলেন—"অপরাহ্ন হইতে ধ্রুবকে না দেখিতে পাওয়ায় জিজ্ঞাসা করাতে যুবরাজ নক্ষত্ররায়ের ভৃত্য কহিল ধ্রুব অন্তঃপুরে যুবরাজের কাছে আছে—শুনিয়া আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক রাত হইতে দেখিয়া আমার আশঙ্কা জন্মিল—অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যুবরাজ নক্ষত্ররায় প্রাসাদে নাই। আমি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহরীরা কিছুতেই

আমার কথা গ্রাহ্য করিল না—এই জন্য বাতায়নের নীচে হইতে মহারাজকে ডাকিয়াছি, আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।"

রাজার মনে একটা ভাব বিদ্যুতের মত চমকিয়া উঠিল। তিনি চারিজন প্রহরীকে ডাকিলেন, কহিলেন "সশস্ত্রে আমার অনুসরণ কর।"

একজন কহিল "মহারাজ, আজ রাত্রে পথে বাহির হওয়া নিষেধ।"

রাজা কহিলেন "আমি আদেশ করিতেছি!"

কেদারেশ্বর সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইলেন, রাজা তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে কহিলেন। বিজন পথে চন্দ্রালোকে রাজা মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

মন্দিরের দ্বার যখন সহসা খুলিয়া গেল—দেখা গেল খড়্গ সম্মুখে করিয়া নক্ষত্র এবং রঘুপতি মদ্যপান করিতেছেন। আলোক অধিক নাই—একটি দীপ জ্বলিতেছে। ধ্রুব কোথায়? ধ্রুব কালী প্রতিমার পায়ের কাছে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—তাহার কপোলের অশ্রু রেখা শুকাইয়া গেছে—ঠোঁট দুটি একটু খুলিয়া গেছে—মুখে ভয় নাই, ভাবনা নাই—এ যেন পাষাণ শয্যা নয়, যেন সে দিদির কোলের উপরে শুইয়া আছে। দিদি যেন চুমো খাইয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়াছে!

মদ খাইয়া নক্ষত্রের প্রাণ খুলিয়া গিয়াছিল, কিন্তু রঘুপতি স্থির হইয়া বসিয়া পূজার লগ্নের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—নক্ষত্রের প্রলাপে কিছু মাত্র কান দিতে ছিলেন না। নক্ষত্র বলিতেছিলেন—"ঠাকুর, তোমার মনে মনে ভয় হচ্চে। তুমি মনে করচ আমিও ভয় করচি! কিছু ভয় নেই ঠাকুর! ভয় কিসের! ভয় কা'কে! আমি তোমাকে রক্ষা করব। তুমি কি মনে কর আমি রাজাকে ভয় করি! আমি সাসুজাকে ভয় করিনে আমি সাজাহানকে ভয় করিনে! ঠাকুর তুমি বল্লে না কেন, আমি রাজাকে ধরে আনতুম, দেবীকে সন্তুষ্ট করে দেওয়া যেত! ওইটুকু ছেলের কতটুকুই বা রক্ত!"

এমন সময়ে সহসা মন্দিরের ভিত্তির উপরে ছায়া পড়িল। নক্ষত্ররায় পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন রাজা। চকিতের মধ্যে নেশা সম্পূর্ণ ছুটিয়া গেল! নিজের ছায়ার চেয়ে নিজে মলিন হইয়া গেলেন। দ্রুতবেগে নিদ্রিত ধ্রুবকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোবিন্দমাণিক্য প্রহরীদিগকে কহিলেন "ইহাদের দুজনকে বন্দী কর।"

চারিজন প্রহরী রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের দুই হাত ধরিল। ধ্রুবকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বিজন পথে জ্যোৎস্নালোকে রাজা প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। রঘুপতি ও নক্ষত্র রায় সে রাত্রে কারাগারে রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পরদিন বিচার। বিচারশালা লোকে লোকারণ্য। বিচারাসনে রাজা বসিয়াছেন, সভাসদেরা চারিদিকে বসিয়াছেন। সম্মুখে দুইজন বন্দী। কাহারও হাতে

শৃঙ্খল নাই। কেবল সশস্ত্র প্রহরী তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া আছে। রঘুপতি পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া আছেন—নক্ষত্র রায়ের মাথা নত।

রঘুপতির দোষ সপ্রমাণ করিয়া রাজা তাঁহাকে বলিলেন—"তোমার কি বলিবার আছে!"

রঘুপতি কহিলেন—"আমাকে বিচার করিবার অধিকার আপনার নাই।"

রাজা কহিলেন—"তবে তোমার বিচার কে করিবে?"

রঘুপতি—"আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেবসেবক, দেবতা আমার বিচার করিবেন।"

রাজা—"ঈশ্বর ত সকলেরই বিচার করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহার রাজদণ্ড। আমাদের দ্বারাই তিনি অপরাধীকে শাস্তিবিধান করিয়া থাকেন। পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার দিবার জন্য জগতে তাঁহার সহস্র অনুচর আছে। আমরাও তাহার একজন। সে কথা লইয়া আমি তোমার সহিত বিচার করিতে চাই না—আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—কাল সন্ধ্যাকালে বলির মানসে তুমি একটি শিশুকে হরণ করিয়াছিলে কি না?"

রঘুপতি কহিলেন—"হাঁ।"

রাজা কহিলেন—"তুমি অপরাধ স্বীকার করিতেছ?"

রঘুপতি—"অপরাধ! অপরাধ কিসের! আমি মায়ের আদেশ পালন করিতেছিলাম, মায়ের কার্য্য করিতেছিলাম, তুমি তাহার ব্যাঘাৎ করিয়াছ—অপরাধ তুমি করিয়াছ—আমি মায়ের সমক্ষে তোমাকে অপরাধী করিতেছি তিনি তোমার বিচার করিবেন।"

রাজা তাঁহার কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন—"আমার রাজ্যের নিয়ম এই—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে বা দিতে উদ্যত হইবে, তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। সেই দণ্ড আমি তোমার প্রতি প্রয়োগ করিলাম। আটবৎসরের জন্য তুমি নির্ব্বাসিত হইলে। প্রহরীরা তোমাকে আমার রাজ্যের বাহিরে রাখিয়া আসিবে।"

প্রহরীরা রঘুপতিকে সভাগৃহ হইতে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল।—রঘুপতি তাহাদিগকে কহিলেন "স্থির হও।" রাজার দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমার বিচার শেষ হইল, এখন আমি তোমার বিচার করিব, তুমি অবধান কর। চতুর্দ্দশ দেবতা পূজার দুই রাত্রে যে কেহ পথে বাহির হইবে, পুরোহিতের কাছে সে দণ্ডিত হইবে, এই আমাদের মন্দিরের নিয়ম। সেই প্রাচীন নিয়ম অনুসারে তুমি আমার নিকটে দণ্ডার্হ।"

রাজা কহিলেন—"আমি তোমার দণ্ডগ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

সভাসদেরা কহিলেন—"এ অপরাধের কেবল অর্থদণ্ড হইতে পারে।"

পুরোহিত কহিলেন—"আমি তোমার দুইলক্ষ মুদ্রা দণ্ড করিতেছি। এখনি দিতে হইবে।"

রাজা কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন—পরে বলিলেন "তথাস্তু।" কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া দুই লক্ষ মুদ্রা আদেশ করিয়া দিলেন। প্রহরীরা রঘুপতিকে বাহিরে লইয়া গেল।

রঘুপতি চলিয়া গেলে নক্ষত্ররায়ের দিকে চাহিয়া রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "নক্ষত্ররায়, তোমার অপরাধ তুমি স্বীকার কর কি না?"

নক্ষত্ররায় বলিলেন "মহারাজ আমি অপরাধী, আমাকে মার্জ্জনা করুন!" বলিয়া ছুটিয়া আসিয়া রাজার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

মহারাজ বিচলিত হইলেন—কিছুক্ষণ বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অবশেষে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন—"নক্ষত্ররায়, ওঠ, আমার কথা শোন। আমি মার্জ্জনা করিবার কে? আমি আপনার শাসনে আপনি রুদ্ধ। বন্দীও যেমন বদ্ধ বিচারকও তেমনি বদ্ধ। একই অপরাধে আমি একজনকে দণ্ড দিব, একজনকে মার্জ্জনা করিব, এ কি করিয়া হয়? তুমিই বিচার কর!"

সভাসদেরা বলিয়া উঠিল—"মহারাজ, নক্ষত্ররায় আপনার ভাই, আপনার ভাইকে মার্জ্জনা করুন্!"

রাজা দৃঢ়স্বরে কহিলেন "তোমরা সকলে চুপ কর। যতক্ষণ আমি এই আসনে আছি, ততক্ষণ আমি কাহারও ভাই নহি, কাহারও বন্ধু নহি।"

সভাসদেরা চারিদিকে চুপ করিলেন। সভা গভীর নিস্তব্ধ হইল। রাজা গম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন—"তোমরা সকলেই শুনিয়াছ—আমার রাজ্যের নিয়ম এই যে—যে ব্যক্তি দেবতার উদ্দেশে জীব বলি দিবে, বা দিতে উদ্যত হইবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড। কাল সন্ধ্যাকালে নক্ষত্ররায় পুরোহিতের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া বলির মানসে একটি শিশুকে হরণ করিয়া ছিলেন। এই অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে আমি তাঁহার আট বৎসর নির্ব্বাসন দণ্ডবিধান করিলাম।"

প্রহরীরা যখন নক্ষত্ররায়কে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, তখন রাজা আসন হইতে নামিয়া নক্ষত্ররায়কে আলিঙ্গন করিলেন, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "বৎস, কেবল তোমার দণ্ড হইল না, আমারও দণ্ড হইল। না জানি পূর্ব্বজন্মে কি অপরাধ করিয়া ছিলাম! যতদিন তুমি বন্ধুদের কাছ হইতে দূরে থাকিবে, দেবতা তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকুন, তোমার মঙ্গল করুন!"

সংবাদ দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। রাজা নিভৃত কক্ষে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। যোড়হাতে কহিতে লাগিলেন—"প্রভু, আমি যদি কখনও অপরাধ করি, আমাকে মার্জ্জনা করিও না, আমাকে কিছুমাত্র দয়া করিও না। আমাকে আমার পাপের শাস্তি দাও। পাপ করিয়া শাস্তি বহন করা যায় কিন্তু মার্জ্জনা ভার বহন করা যায় না প্রভু।"

নক্ষত্ররায়ের প্রেম রাজার মনে দ্বিগুণ জাগিতে লাগিল। নক্ষত্ররায়ের ছেলেবেলাকার মুখ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। সে যে সকল খেলা করিয়াছে, কথা কহিয়াছে, কাজ করিয়াছে, তাহা একে একে তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। একেক্‌টা দিন, একেক্‌টা

রাত্রি, তাহার সূর্য্যালোকের মধ্যে তাহার তারাখচিত আকাশের মধ্যে শিশু নক্ষত্ররায়কে লইয়া তাঁহার সম্মুখে উদয় হইল। রাজার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

সোহাগ।

মার কোলে শুয়ে শিশু
হাসি দিয়ে পায় চুমো ;
আনমনে গান গেয়ে
মা বলিছে ঘুমো ঘুমো।

পা দুখানি দুপু দুপু
ফেলিছে মায়ের গায়,
ছোট হাতে মুটো তুলে
আকুল করিছে মায়।

কচি দেহের দৌরাত্মে
মায়ের ধরেনা হাসি—
হেসে, ভেসে যায় গান,
চুমো হোয়ে যায় হাসি।

নিরালা ঘরের মাঝে,
নিঝুম দুপুর বেলা,
মায়েতে ছেলেতে, মরি,
কতই করিছে খেলা।

মার আঁখী পানে বাছা
বলে হাসিমাখা বুলি ;
মার কোলে দোলে সুখে
স্বরগ-স্বদেশ ভুলি।

মায়ের ঘুমের গানে
বায়ু আলুথালু গতি,—

দুপুর নিঝুম আরো,
চৌদিক অলস অতি।

মুদে আসে ঢুলু ঢুলু,
ধীরে, শিশু আঁখি দুটি,
নুয়ে পড়ে ভুঁয়ে মাথা,
খুলে যায় ছুটি মুটি।

মায়ের কোলেতে দেহ—
ত্রিদিবের কোলে প্রাণ—
কল্পনা ছলনা ছাড়
উপমার নাহি স্থান।

নন্দনের ছেলেগুলি,
স্বপনের ডালাধরি,
ধীরে তারে ঘিরে বসে
হাসি দেয় প্রাণ ভরি।

ঘুমন্ত আননে তার
হাসিটি জাগ্রত দেখি,
গ'লে যায় মার মন,
ভেসে যায় দুটি আঁখি।

কিসে যে শিহরে তনু
মাই তাহা জানে খালি,
প্রাণখানি আনি মুখে
চুমো দিয়ে দেয় ঢালি।

ঘুমায় রে শিশু সুখে
স্বপনে ত্রিদিব হেরি;
হাসিভরা স্বর্গ-মুখ
মা দেখে নয়ন ভরি।

ঠগী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে ঠগ্‌দিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল। পূর্ব্বে পথ ঘাট সকল আজকালের মত বিস্তীর্ণ ও পরিষ্কার ছিল না ; প্রায়ই সুঁড়ি রাস্তা, দুধারে জন-শূন্য বন, মধ্যে মধ্যে জলা। রাস্তার মধ্যে প্রায়ই ব্যাঁক্ ছিল, এক ক্রোশ যাইতে হইলে ২৫ বার মোড় ফিরিতে হইত। এক মোড় হইতে, আর এক মোড়ে গেলে আর কেহ কাহাকে দেখিতে পাইত না। এই সকল দুর্গম পথে যাইতে হইলে পথিকেরা কখন একক্ যাইত না, দল বাঁধিয়া যাতায়াত করিত।

তখন ভয়ানক দস্যুভয় ছিল; নগর, গ্রাম, রাস্তা, ঘাট এমন স্থান অতি অল্পই ছিল যেখানে তাহাদের সমাগম ছিল না। কেবল উদরান্নের জন্য দস্যুবৃত্তি করিতেছি তাহাদের এরূপ ধারণা থাকিলে সহজেই তাহাদিগকে শাসন করা যাইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহারা দস্যুবৃত্তিকে ধর্ম্ম বলিয়া জানিত ও বলিত দেবীর আদেশ-মত তাহারা কার্য্য করিয়া থাকে। যে কার্য্যের সহিত ধর্ম্মের সংস্রব থাকে তাহা নির্মূল করা সহজ কথা নহে আর ৪।৫ বৎসরের কার্য্যও নহে। কাজেই এই দস্যুবৃত্তি এমন বাড়িয়াছিল যে জনসাধারণের রাস্তা ঘাট চলা দায়। ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকায় তাহাদিগকে কেহ ঠগ বলিলে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিত ; ও কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে "আমরা সাত পুরুষ দেবীর কার্য্য করিতেছি" বলিয়া আপনাদিগের মহত্ত্ব জানাইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠগী তাহাদের কেবল ব্যবসা ছিল না ইহাকে তাহারা ধর্ম্ম বলিয়া জানিত। তাহারা কালীদেবীর উপাসক ছিল। তাহাদের মনে দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে দেবী তাহাদের সহায়। বিশেষ কতকগুলি বস্তু ছিল যাহা দেখিলে তাহারা জানিতে পারিত, দেবী আজ সদয় হইয়াছেন, আর কতকগুলি ছিল যাহা দেখিয়া তাহারা কার্য্যে বিরত হইত। কুম্ভকার, তেলি ও খঞ্জ দেখিলে সেদিন তাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত না। দেবীর পূজান্তে আপন আপন কার্য্যে বহির্গত হইয়া যে দিন মনমত নরহত্যা করিয়া বহুল ধনরত্নাদি সংগ্রহ করিতে পারিত সে দিন আর আমোদের সীমা থাকিত না, পূজার ধুম্ পড়িয়া যাইত। কিন্তু এই সকল কার্য্য এত গোপনে সমাধা হইত যে দলভুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ জানিতে পারিত না। কোন ব্যাঘাত বা বিপদ ঘটিলে তাহারা ভাবিত নিশ্চয়ই পূজার ত্রুটি হইয়া থাকিবে, বা যাত্রাকালে কোন অশুভ দর্শন হইয়াছে। তাহাদের ধ্রুব বিশ্বাস ছিল যে শুভাশুভ দর্শনই তাহাদের জয় পরা-জয়ের মুখ্য কারণ।

ঠগেরা অতি নীচ ও নৃশংস ভাবে কাপুরুষের ন্যায় পথিকগণের প্রাণ সংহার করিত। তাহারা পুরুষানুক্রমে এই পাপকার্য্যে লিপ্ত থাকিবার জন্য দু একটি করিয়া এক

হৃষ্টপুষ্ট দল বাঁধিয়াছিল। তাহারা এরূপ ভাবে থাকিত যে কেহই তাহাদিগকে দস্যু বলিয়া চিনিতে পারিত না। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যস্থলে ভিন্ন ভিন্ন বেশে বেড়াইত, কখন এক স্থানে দল বাঁধিয়া ফিরিত না; সকলেই অল্পাধিক অন্তরে থাকিত। ঈষৎ ইঙ্গিত মাত্র সহজেই একত্রে মিলিতে পারিত। কখন বা তাহাদের মধ্যে এক জনকে সম্রান্ত জমীদার সাজাইয়া সকলে তাহার ভৃত্যের ন্যায় গমন করিত ও পাল্‌কি মধ্যে অস্ত্রাদি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিত, পথিকেরা ভাবিত, বাড়ির পরিবারেরা পাল্‌কি মধ্যে আছে। এইরূপ প্রচ্ছন্ন ভাবে কাহারও সন্দেহ উদ্দীপন না করিয়া কোন এক পূর্ব্বনির্দিষ্ট পথিকের সহিত (যেন ঘটনা ক্রমে) আসিয়া মিলিত, ও কোন এক সুঁড়ি পথে বা জঙ্গলের আড়ালে পাইলেই অবসর বুঝিয়া এক জন সেই হতভাগ্য পথিকের গলদেশে একগাছি দড়ির বা কাপড়ের ফাঁশ অল্পদূর হইতে নিক্ষেপ করিত, দেখিতে দেখিতে অন্য এক জন সেই দড়ির অপর খুঁট ধরিয়া খুব টানিত, আর এক জন তৎক্ষণাৎ তাহার পা ধরিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিত। পথিকের আর নড়িবার শক্তি নাই, যমদূতেরা স্বয়ং ধরিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল!

দেখিতে দেখিতে এই হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়া যাইত। পরে তাহারা যাহা কিছু পাইত সংগ্রহ করিয়া মৃতদেহটি তৎক্ষণাৎ গর্ত্তখনন করিয়া পুতিয়া ফেলিত। প্রবাদ আছে যে তাহারা এমন এক মন্ত্রপূত কুঠার দ্বারা ভূমি খনন করিত যে তাহাতে কিছুমাত্র শব্দ হইত না। তাহারা প্রতি সপ্তম দিবসে কুঠার পূজা করিত ও তাহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত। অন্য কোন অস্ত্রের দ্বারা সমাধি খনন করিবার আদেশ ছিল না। খনন কালে কোন পথিককে আসিতে দেখিলে একখানি পরিষ্কার চাদর দিয়া মৃতদেহটি ঢাকিয়া ফেলিত ও সকলে তাহাকে বেষ্টন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিত। পথিকেরা ভাবিত, কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়া থাকিবে।

সাধারণকে ধাঁধা দিবার জন্য তাহাদিগের নানাবিধ কৌশল ছিল। হত্যান্তে কখন কখন বা কোন এক দল ভদ্র লোককে আসিতে দেখিলে, তৎক্ষণাৎ একখানি পরদা দ্বারা শবটিকে আড়াল করিত, দুএকজন মাত্র বাহিরে থাকিত অপর সকলে পরদার মধ্যে থাকিয়া সমাধি খনন পূর্ব্বক লাশ পুঁতিয়া ফেলিত। পথিকেরা ভাবিত, স্ত্রীলোকেরা পরদামধ্যে রন্ধনাদি করিতেছে। কেহ কেহ বা একটু অগ্রসর হইয়া রাস্তার ধারে শুইয়া পড়িত, ও পীড়ার এমন সকল ভাণ দেখাইত যেন শ্বাসরোগ যন্ত্রণায় মৃত্যু উপস্থিত। দেখিয়া পথিক মাত্রেরই দয়া হইত—ও কেহ তাহাকে ফেলিয়া শীঘ্র যাইতে পারিত না; যে যাহা ঔষধ জানে তাহার অনুসন্ধান করিত—কেহ বা তাহা লইয়া তর্ক আরম্ভ করিত, এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইলে ওদিকেও লাশ পুতিয়া ফেলা বা গাপ করা সহজ হইত।

কখন কখন তাহারা একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক দ্বারা ঐ সকল পাপকর্ম্ম সমাধা করিত।

স্ত্রীলোকটি পথিপার্শ্বে দাড়াইয়া অনবরত অশ্রুধারা বর্ষণ করিত, পথিকেরা তাহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত আমি অমুক স্থানে যাইব—সন্ধ্যা আগতা প্রায়, পথও চিনি না চলিতেও পারিতেছি না, তাই কাঁদিতেছি। সুন্দরীকে রোদন করিতে দেখিয়া যাঁহার দয়া হইত—তিনি ঘোটকোপরি আপন পশ্চাতে তাহাকে তুলিয়া লইতেন। (এই খানে বলা আবশ্যক যে পূর্ব্বে পশ্চিমাঞ্চলের পথিকেরা প্রায় ঘোড়া বা টাট্টু সাহায্যে পথ চলিত)। পিশাচী অবসর পাইলেই উপকারকের গলায় ফাঁশ দিয়া ঘোটক হইতে নিম্নে ফেলিয়া দিত; মুহূর্ত্তমধ্যে লুক্কায়িত অনুচরবর্গ ব্যাধের ন্যায় আসিয়া তাহাকে বধ করিত। এখনো গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের পার্ব্বতীয় পথে স্ত্রী-লোক দ্বারা এইরূপ নৃশংস কার্য্য সকল সমাধা হইতে শুনা যায়।

Dr Kaye সাহেব লিখিয়াছেন "ভারতে জীবনের মূল্য নাই, ভারতবাসিরা জীবনকে জীবন জ্ঞান করে না। অমুক আত্মহত্যা করিয়াছে বা রামকে শ্যাম মারিয়া ফেলিয়াছে এ সকল কথায় তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না, অদৃষ্টে ছিল তাই ঘটিয়াছে এই বলিয়া উপসংহার করে। রাম কোন কার্য্যোপলক্ষে অন্য এক গ্রামে গিয়াছে, আজ মাসাবধি হইল সে ফিরিল না; তাহার কোন খবরও নাই, কেহ খোঁজও লইল না, হদ্দ বলিল "বোধ হয় মরে গেছে।" অনুসন্ধানের জন্য পুলিষও নিযুক্ত হইল না, সংবাদ পত্রত ছিল না যে আলোচনা হইবে—আর, যাহা ছিল তাহাতেও সকল সামান্য বিষয়ের উল্লেখ পর্য্যন্ত হইত না। ১৮৩৩ অব্দের "সমাচার দর্পণে" প্রকাশিত হয়—"এক মাসে একশত ঠগ গড়ে ৮০০ লোক্ মারিয়া থাকে; ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে নর্ম্মদা ও শতদ্রু মধ্যস্থিত প্রদেশে প্রতি বৎসরে প্রায় ১০৮০৯ নর হত্যা হয়।" কি—ভয়ানক কথা! ভারতবর্ষে তখন সকল পথই এইরূপ বিপদসঙ্কুল ও ভয়াবহ ছিল।

চিরঞ্জীবেষু।

তোমার চিঠি পড়িয়া বড় খুসী হইলাম। বাস্তবিক, বাঙ্গালী জাতি যেরূপ চালাকী করিতে শিখিয়াছে, তাহাতে তাহাদের কাছে কোন গম্ভীর বিষয় বলিতে বা কোন শ্রদ্ধাস্পদের নাম করিতে মনের মধ্যে সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। আমাদের এককালে গৌরবের দিন ছিল, আমাদের দেশে এককালে বড় বড় বীর সকল জন্মিয়া ছিলেন—কিন্তু বাঙ্গালীর কাছে ইহার কোন ফল হইল না। তাহারা কেবল ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুনকে পুরাতত্ত্বের কুলুঙ্গি হইতে পাড়িয়া ধূলা ঝাড়িয়া সভাস্থলে পুঁতুল নাচ দেখায়। আসল কথা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণ আমাদের দেশে মরিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে বাতাসে ছিলেন,

সে বাতাস এখন আর নাই। স্মৃতিতে বাঁচিতে হইলেও তাহার খোরাক চাই। নাম মনে করিয়া রাখা ত স্মৃতি নহে, প্রাণ মনে করিয়া রাখাই স্মৃতি। কিন্তু প্রাণ মনে রাখিতে হইলেই তাহার উপযোগী বাতাস চাই, তাহার উপযোগী খাদ্য চাই। আমাদের হৃদয়ের তপ্ত রক্ত সেই স্মৃতির শিরার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া চাই। মনুষ্যত্বের মধ্যেই ভীষ্ম দ্রোণ বাঁচিয়া আছেন। আমরা ত নকল মানুষ! অনেকটা মানুষের মত! ঠিক মানুষের মত খাওয়া দাওয়া করি, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই, হাই তুলি ও ঘুমোই—দেখিলে কে বলিবে যে মানুষ নই! কিন্তু ভিতরে মনুষ্যত্ব নাই। যে জাতির মজ্জার মধ্যে মনুষ্যত্ব আছে, সে জাতিতে মহত্বকে কেহ অবিশ্বাস করিতে পারে না, মহৎ আশাকে কেহ গাঁজাখুরী মনে করিতে পারে না, মহৎ অনুষ্ঠানকে কেহ হুজুক বলিতে পারে না, সেখানে সঙ্কল্প কার্য্য হইয়া উঠে, কার্য্য সিদ্ধিতে পরিণত হয়। সেখানে জীবনের সমস্ত লক্ষণই প্রকাশ পায়। সে জাতিতে সৌন্দর্য্য ফুলের মত ফুটিয়া উঠে, বীরত্ব ফলের মত পক্কতা প্রাপ্ত হয়। আমার বিশ্বাস, আমরা যতই মহত্ব উপার্জ্জন করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ের বল যতই বাড়িয়া উঠিবে—আমাদের দেশের বীরগণ ততই পুনর্জ্জীবন লাভ করিবেন। পিতামহ ভীষ্ম আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া উঠিবেন। আমাদের সেই নূতন জীবনের মধ্যে আমাদের দেশের প্রাচীন জীবন জীবন্ত হইয়া উঠিবে। নতুবা মৃত্যুর মধ্যে জীবনের উদয় হইবে কি করিয়া? বিদ্যুৎ প্রয়োগে মৃতদেহ জীবিতের মত কেবল অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী করে মাত্র। আমাদের দেশে সেই বিচিত্র ভঙ্গিমার প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। কিন্তু হায় হায়, কে আমাদের এমন করিয়া নাচাইতেছে! কেন আমরা ভুলিয়া যাইতেছি যে আমরা নিতান্ত অসহায়! আমাদের এত সব উন্নতির মূল কোথায়! এসব উন্নতি রাখিব কিসের উপরে! রক্ষা করিব কি উপায়ে! একটু নাড়া খাইলেই দিন-দুয়ের সুখস্বপ্নের মত সমস্তই যে কোথায় বিলীন হইয়া যাইবে! অন্ধকারের মধ্যে বঙ্গদেশের উপরে ছায়াবাজির উজ্জল ছায়া পড়িয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী উন্নতি মনে করিয়া আমরা ইংরাজি ফেষানে করতালি দিতেছি। উন্নতির চাকচিক্য লাভ করিয়াছি কিন্তু উন্নতিকে ধারণ করিবার, পোষণ করিবার ও রক্ষা করিবার বিপুল বল কই লাভ করিতেছি! আমাদের হৃদয়ের মধ্যে চাহিয়া দেখ, সেখানে সেই জীর্ণতা, দুর্ব্বলতা, অসম্পূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অসত্য, অভিমান, অবিশ্বাস, ভয়। সেখানে চপলতা, লঘুতা, আলস্য, বিলাস। দৃঢ়তা নাই উদ্যম নাই, কারণ সকলেই মনে করিতেছেন, সিদ্ধি হইয়াছে, সাধনার আবশ্যক নাই। কিন্তু যে সিদ্ধি সাধনা ব্যতীত হইয়াছে তাহাকে কেহ বিশ্বাস করিও না। তাহাকে তোমার বলিয়া মনে করিতেছ কিন্তু সে কখনই তোমার নহে। আমরা উপার্জ্জন করিতে পারি, কিন্তু লাভ করিতে পারি না। আমরা জগতের সমস্ত জিনিষকে যতক্ষণ না আমার মধ্যে ফেলিয়া আমার করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ আমরা কিছুই পাই না। ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িলেই তাহাকে পাওয়া বলে না। আমাদের চক্ষের স্নায়ু সূর্য্য-কিরণকে আমাদের উপযোগী আলো আকারে গড়িয়া

নয়, তা না হইলে আমরা অন্ধ; আমাদের অন্ধ চক্ষুর উপরে সহস্র সূর্য্যকিরণ পড়িলেও কোন ফল নাই। আমাদের হৃদয়ের সেই বায়ু কোথায়! এ পক্ষাঘাতের আরোগ্য কিসে হইবে! আমরা সাধনা কেন করি না? সিদ্ধির জন্যে আমাদের মাথাব্যথা নাই বলিয়া। সেই মাথাব্যথাটা গোড়ায় চাই।

অর্থাৎ, বাতিকের আবশ্যক। আমাদের শ্লেষ্মাপ্রধান ধাত, আমাদের বাতিকটা আদবেই নাই। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান্, কোন বিষয়ে পাগ্‌লামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজগার করিব, ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব; দাঙ্গাহাঙ্গামাতে নাই, কিন্তু মকদ্দমা মামলা ও দলাদলিতে আছি। অর্থাৎ হাঙ্গামের অপেক্ষা হুজ্জৎটা আমাদের কাছে যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয়। লড়াইয়ের অপেক্ষা পলায়নেই পিতৃযশ রক্ষা হয় এইরূপ আমাদের বিশ্বাস। এইরূপ আত্যন্তিক স্নিগ্ধভাব ও মজ্জাগত শ্লেষ্মার প্রভাবে নিদ্রাটা আমাদের কাছে পরম রমণীয় বলিয়া বোধ হয়, স্বপ্নটাকেই সত্যের আসনে বসাইয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করি।

অতএব স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আমাদের প্রধান আবশ্যক বাতিক। সে দিন একজন বৃদ্ধ বাতিকগ্রস্তের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি বায়ুভরে একেবারে কাৎ হইয়া পড়িয়াছেন—এমন কি অনেক সময়ে বায়ুর প্রকোপ তাঁহার আয়ুর প্রতি আক্রমণ করে। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলোচনা করিয়া স্থির করিলাম, যে, "আর কিছু না, আমাদের দেশে একটি বাতিকবর্দ্ধনী সভার আবশ্যক হইয়াছে।" সভার উদ্দেশ্য আর কিছু নয় কতকগুলা ভালমানুষের ছেলেকে ক্ষেপাইতে হইবে। বাস্তবিক, প্রকৃত ক্ষেপা ছেলেকে দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়।

বায়ুর মাহাত্ম্য কে বর্ণনা করিতে পারে! যে সকল জাত উনবিংশ শতাব্দীর পরে ঊনপঞ্চাশ বায়ু লাগাইয়া চলিয়াছেন, আমরা সাবধানীরা কবে তাঁহাদের নাগাল পাইব! য়ুরোপে চাহিয়া দেখ, কোন্ কাজে না বায়ুর প্রভাব লক্ষিত হয়! বাতিক গেল, শ্যালীকে বিবাহ করিতে হইবে—আর রক্ষা নাই; অমনি পার্ল্যামেন্ট আলোড়ন করিয়া, সমাজে হুলস্থূল বাধাইয়া যতক্ষণ না শ্যালী বিবাহযোগ্যা বলিয়া প্রমাণ হইবে ততক্ষণ বাতিক উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে বৈ কমিবে না। বাতিক অত্যন্ত সংক্রামক, বাতিক দেখিতে দেখিতে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, ক্রমে ঝড়েতে পরিণত হয়। এই জন্য ইংলণ্ডে দেখিতে পাই, যে কোন উদ্দেশ্যে সভা হয় বর্ষে বর্ষে তাহার দল বাড়িয়া উঠিতে থাকে। আমাদের দেশে কোন সভা হইলে দিনে দিনে লোক ভাগিয়া যায়, দল কমিয়া আসে। আমাদের যে অল্প একটু বায়ু আছে, সভার নিয়ম রচনা করিতে ও বক্তৃতা দিতেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া যায়।

মহৎ আশা, মহৎ ভাব, মহৎ উদ্দেশ্যকে সাবধানী বিষয়ী লোকেরা বাষ্পের ন্যায় জ্ঞান করেন। কিন্তু এই বাষ্পের বলেই উন্নতির জাহাজ চলিতেছে এই বাষ্পকে খাটা

ইতে হইবে, এই বায়ুকে পালে আটক করিতে হইবে। এমন তুমুল শক্তি আর কোথায় আছে! আমাদের দেশে এই বাষ্পের অভাব বায়ুর অভাব। আমরা উন্নতির পালে একটুখানি ফুঁ দিতেছি, যতখানি গাল ফুলিতেছে ততখানি পাল ফুলিতেছে না।

বৃহৎভাবের নিকটে আত্মবিসর্জ্জন করাকে যদি পাগ্‌লামী বলে, তবে সেই পাগ্‌লামি এক্‌কালে প্রচুর পরিমাণে আমাদের ছিল। ইহাই প্রকৃত বীরত্ব। অসহায় ফিরিঙ্গির ছেলেকে তিনজনে পড়িয়া ছাতার বাড়ি মারাকে বীরত্ব বলে না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে রাম যে রাজ্য ছাড়িয়া বনে গেলেন তাহাই বীরত্ব, এবং সীতা ও লক্ষ্মণ যে তাঁহাদের অনুসরণ করিলেন তাহাও বীরত্ব। ভরত যে রামকে ফিরাইয়া আনিতে গেলেন, তাহা বীরত্ব, এবং হনুমান যে প্রাণপণে রামের সেবা করিয়াছিলেন তাহাও বীরত্ব। হিংসা অপেক্ষা ক্ষমায় যে অধিক বীরত্ব, গ্রহণের অপেক্ষা ত্যাগে অধিক বীরত্ব, এই কথাই আমাদের কাব্যে ও শাস্ত্রে বলিতেছে। পালোয়ানীকে আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বড় জ্ঞান করিত না। এই জন্য বাল্মীকির রাম রাবণকে পরাজিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, রাবণকে ক্ষমা করিয়াছেন। রাম রাবণকে দুইবার জয় করিয়াছেন। একবার বাণ মারিয়া একবার ক্ষমা করিয়া। কবি বলেন, তন্মধ্যে শেষের জয়ই শ্রেষ্ঠ। হোমরের একিলিস পরাভূত হেক্টরের মৃতদেহ ঘোড়ার লেজে বাঁধিয়া সহর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন, রামে একিলিসে তুলনা কর। য়ুরোপীয় মহাকবি হইলে পাণ্ডবদের যুদ্ধজয়েই মহাভারত শেষ করিতেন, কিন্তু আমাদের ব্যাস বলিলেন, রাজ্য গ্রহণ করায় শেষ নহে রাজ্য ত্যাগ করায় শেষ। যেখানে সব শেষ তাহাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেবল তাহাই নহে আমাদের কবিরা পুরস্কারেরও লোভ দেখান নাই। ইংরাজেরা Utilitarian, কতকটা দোকানদার, তাই তাঁহাদের শাস্ত্রে Poetical justiceনামক একটা শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেনা পাওনা, সৎকাজের দরদাম করা। আমাদের সীতা চিরদুঃখিনী—রাম লক্ষ্মণের জীবন দুঃখে কষ্টে শেষ হইল। এত বড় অর্জ্জুনের বীরত্ব কোথায় গেল, অবশেষে দস্যুদল আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে যাদবরমণীদের কাড়িয়া লইয়া গেল তিনি গাণ্ডীব তুলিতে পারিলেন না। পঞ্চপাণ্ডবের সমস্ত জীবন দারিদ্র্যে দুঃখে শোকে অরণ্যে কাটিয়া গেল, শেষেই বা কি সুখ পাইলেন! হরিশ্চন্দ্র যে এত কষ্ট পাইলেন, এত ত্যাগ করিলেন, অবশেষে কবি তাঁহার কাছ হইতে পুণ্যের শেষ পুরস্কার স্বর্গও কাড়িয়া লইলেন। ভীষ্ম যে রাজপুত্র হইয়া সন্যাসীর মত জীবন কাটাইলেন, তাঁহার সমস্ত জীবনে সুখ কোথায়! সমস্ত জীবন যিনি আত্মত্যাগের কঠিন শয্যায় শুইয়াছিলেন মৃত্যুকালে তিনি শরশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিলেন!

. এককালে মহৎ ভাবের প্রতি আমাদের দেশের লোকের এত বিশ্বাস এত নিষ্ঠা ছিল! তাঁহারা মহত্বকেই মহত্বের পরিণাম বলিয়া জানিতেন, ধর্ম্মকেই ধর্ম্মের পুরস্কার জ্ঞান করিতেন।

আর আজ কাল! আজকাল আমাদের এমনি হইয়াছে যে কেরানীগিরি ছাড়া আর কিছুরই উপরে আমাদের বিশ্বাস নাই—এমন্ কি বানিজ্যকেও পাপ্‌গামী জ্ঞান করি; দরখাস্তকে ভবসাগরের তরণী করিয়াছি, নাম সহি করিয়া আপনাকে বীর মনে করিয়া থাকি।

আজ তোমাতে আমাতে ভাব হইল ভাই! মহত্ত্বের একাল আর সেকাল কি! যাহা ভাল তাহাই আমাদের হৃদয় গ্রহণ করুক, যেখানে ভাল সেখানেই আমাদের হৃদয় অগ্রসর হউক! আমাদের লঘুতা, চপলতা, সঙ্কীর্ণতা দূরে যাক্! অজ্ঞতা ও ক্ষুদ্রতা হইতে প্রসূত বাঙ্গালীসুলভ অভিমানে মোটা হইয়া চক্ষুরুদ্ধ করিয়া আপনাকে সকলের চেয়ে বড় মনে না করি ও মহৎ হইবার আগে দেশকালপাত্র নির্ব্বিশেষে মহতের চরণের ধূলি লইতে পারি এমন বিনয় লাভ করি।

শুভাশীর্ব্বাদক
শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

ভূমিকম্প।

ভারতের উত্তরে কাশ্মীরের ভূমিকম্পের উপদ্রব শেষ হইতে না হইতেই ভারতের পূর্ব্বে বঙ্গদেশও সেই উপদ্রবে আক্রান্ত হইল। কাশ্মীরের কত পর্ব্বত ভূমিসাৎ হইয়া উপত্যকায়—কত উপত্যকা পাহাড়ে পরিণত হইল, কত সহস্র লোক সেই ভীষণ ভূমিকম্পের কঠোর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল! এদিকে বঙ্গেও সেই দশা;—কত স্থানের প্রকাণ্ড অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল, কত শুষ্ক ভূমি জলাশয়ে পরিণত হইল,—কত স্থান ফাটিয়া ছারখার হইল, কত নগরবাসী বিলুপ্ত হইল! কাশ্মীর ও বঙ্গের ভূমিকম্পের কথা এখনও আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যেন কম্পিত হইতেছে। পণ্ডিতেরা ভূমির এই প্রলয়কারী ভীষণ কাণ্ডের যে সকল কারণ নির্ণয় করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে লিখিবার এই উপযুক্ত সময়।

ভূমির পৃষ্ঠে মনুষ্য কত লক্ষ লক্ষ ইমারত নির্ম্মাণ করিয়াছে, কত লক্ষ লক্ষ বৃহদাকার পর্ব্বত তাহার উপরে গর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে, কত লক্ষ লক্ষ নদী তাহার উপর দিয়া নির্ভয়ে বহিয়া যাইতেছে; ইহা মনে হইলে ভূপৃষ্ঠ যে অত্যন্ত দৃঢ় তাহা সকলেরই অনুমান হয়। মনে হয় যে সেই ভূপৃষ্ঠ যখন এমন শক্ত পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া পৃথিবীময় বেষ্টিত রহিয়াছে তখন তাহার উপর যত কেন চাপ দেওয়া যাউক না সে তাহা অনায়াসে বহন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা নহে—ভূপৃষ্ঠ অনেকদূর পর্য্যন্ত

বিস্তৃত আছে বলিয়াই তাহার ভারবহনের শক্তি খুব কম, এবং তাহা দৃঢ়ও নহে।

প্রকৃতির নিয়ম এই যে যদি কোন পদার্থের উপর চাপ দেওয়া যায় তবে তাহা সেই চাপের বলে সঙ্কুচিত হইবে, এবং সেই সঙ্কোচনে পদার্থের ক্ষুদ্র অণুগুলি ঘর্ষিত হইয়া উত্তপ্ত হইবে। ভূপৃষ্ঠের উপর দিবারাত্র যে সকল গুরুতর চাপ পড়ে, সেই চাপের বলে ভূপৃষ্ঠ সঙ্কুচিত হইতেছে, এবং ভূপৃষ্ঠ দৃঢ় নয় বলিয়া সেই সঙ্কোচনে ভূগর্ভে সর্ব্বদা উত্তাপ সঞ্চিত রহিয়াছে। এই উত্তাপ হইতে যদিও ভূগর্ভে নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভূপৃষ্ঠের উপরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহারা যদি ভূমধ্যস্থ বিপ্লবের সহিত যোগ না দিত তাহা হইলে ভূমিকম্পের এরূপ প্রলয় মূর্ত্তি আমরা দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ। ভূমির উপরিভাগে বায়ুস্তরের চাপের কমবেশ ভূমিকম্পের একটি প্রধান কারণ।

ভাদ্রমাসের "বালকে" 'বায়ুস্তরের চাপ' নামক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে প্রতি এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া স্থানের উপর সচরাচর ৭॥ সের বায়ুর চাপ পড়ে। বায়ুর চাপ মাপিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র আছে তাহাকে বায়ুমান যন্ত্র (Barometer) বলে। এই যন্ত্রের উপরি ভাগে ইঞ্চির পরিমাণ আছে। বায়ুর চাপ অনুযায়ী সেই যন্ত্রস্থিত পারা উচ্চে উঠে বা নীচে নামে, বায়ু হাল্‌কা হইলে নীচে নামে ও ভারি হইলে উচ্চে উঠে। বায়ুর স্বাভাবিক অর্থাৎ ৭॥ সের চাপে পারা ইঞ্চি-পরিমাণের ৩০ চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে। কিন্তু সেই পারা যদি এক ইঞ্চি উচ্চে (৩১ চিহ্নিত স্থানে) উঠে তবে জানা যাইবে যে প্রতি এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া স্থানে বায়ুর চাপ ২ সের অপেক্ষা কিছু ভারি হইল। এ চাপ বড় সামান্য নহে; কারণ এক ইঞ্চি লম্বা ও এক ইঞ্চি চওড়া স্থানে যদি এই হইল তবে প্রতি এক ফুট লম্বা ও এক ফুট চওড়া স্থানে বায়ুর চাপ ৮মণ ৫সের এবং প্রতি এক ক্রোশ লম্বা ও এক ক্রোশ চওড়া ভূমির উপর ৪৬৯৩৪০০০ মণ বায়ুর চাপ বাড়িল। ভূপৃষ্ঠ সচরাচর বায়ুর যে চাপ বহন করে, তাহার সহিত এই গুরু চাপ যুক্ত হইল। এইরূপে কোথাও বায়ুর চাপ লঘু, কোথাও বায়ুর চাপ গুরুতর হইলে, যেখানে চাপ গুরুতর হয় সেখানকার ভূমি যদি অপেক্ষাকৃত নরম হয় তবে ভূতলের সামঞ্জস্য (Equilibrium) নষ্ট হয়, সুতরাং ভূমিকম্পের আবির্ভাব দেখা যায়।

বায়ুর চাপ যেরূপ ভূমিকম্পের প্রধান কারণ, জলের চাপও সেইরূপ ভূমিকম্পের আর একটি কারণ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। সমুদ্রের জলের কিছু স্থিরতা নাই। আজ সমুদ্র একস্থলে দাঁড়াইয়া আছে, কাল হয়ত দেখিবে যে সেই সমুদ্র অগ্রসর হইয়া কত ক্রোশ ভূমি দখল করিয়াছে। আবার হয়ত কিছুদিন পরে তাহা পূর্ব্বস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের প্রভাব একত্র হইলে সমুদ্রের জল অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, এই সময়ে বায়ু যদি প্রচণ্ডবেগে তীরাভিমুখে বহিতে থাকে, তবে সমুদ্র নিকটস্থ

ভূমির উপর উঠিয়া পড়ে, শুষ্ক ভূমির উপর এখন জলের কতটা চাপ আসিয়া পড়িল। জলের এই গুরুতর চাপ এবং সমুদ্রের তরঙ্গের আঘাত ও প্রতিঘাত ভূপৃষ্ঠ সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং তাহারা কত ক্রোশ নীচে পর্য্যন্ত ফাটিয়া যায়! এইরূপে ফাটিয়া ফাটিয়া ভূগর্ভে যে সকল গহ্বর নির্ম্মিত হয়, ফাটাস্থান বহিয়া জল তাহার মধ্যে সঞ্চিত হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে ভূমির মধ্যে যে উত্তাপ আছে তাহা হইতেই যত বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, সেই বিপ্লবের কারণ জল। উত্তাপের সাহায্যে গহ্বরস্থিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। গহ্বরের সহিত যদি উপরের বায়ুর অথবা বাহিরের সমুদ্রের যোগ থাকে তবে সেই বাষ্প অনায়াসেই বাহির হইয়া যাইতে পারে। আর যদি তাহা না থাকে তবে সেই বাষ্প আবদ্ধ থাকিয়া যখন অত্যন্ত অধিক হইয়া পড়ে,তখন বলপূর্ব্বক অন্য গহ্বরে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় গহ্বরে গমন করিয়া তথাকার বাষ্পের সহিত মিলিত হয়। এইরূপে অল্পে অল্পে বলবৃদ্ধি হইলে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করে। ভূমির মধ্যে যত প্রকার বাধা আছে মহাগর্জ্জন করিয়া সে সকল ভগ্ন করিয়া ফেলে, এই কারণে ভূমিকম্পের সময় আমরা ভূমির নীচে এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাই। নিকটে যদি কোন আগ্নেয় গিরির মুখ থাকে তবে তাহা হইতে, নহিলে ভূমি ভেদ করিয়া, যেমন করিয়া হউক—বাহির হইবেই। বাষ্প বাহির হইবার সময় ভূগর্ভস্থিত যে সকল বাধা ভগ্ন করে সেই সকল বাধার বল অনুযায়ী ভূমি কম্পিত হইতে থাকে। ইহা বলা আবশ্যক যে জলের বাষ্প ব্যতীত ভূগর্ভে গন্ধক অঙ্গার ইত্যাদি ধাতুময় পদার্থের বাষ্পও রহিয়াছে।

ভূমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উপদ্রব একই কারণে হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে পরস্পর নিকট সম্বন্ধ আছে। সমস্ত আগ্নেয় গুহা পর্ব্বতের উপরে স্থিত। তাহাদের মধ্যে যে সকল ধাতুময় প্রস্তর আছে, ভূগর্ভের উত্তাপে তাহারা সর্ব্বদা জ্বলন্ত অবস্থায় থাকে। ভূমিকম্পের সময় ভূমির মধ্যস্থ বাষ্প যেমন তাহাদের মধ্য দিয়া বাহির হইতে যায় অমনি সেই জ্বলন্ত পদার্থ দ্রুত বেগে বাহির হইতে থাকে। যে সকল দেশে আগ্নেয় উৎপাত অত্যন্ত অধিক সেখানে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থানে ভূমিকম্পের প্রতাপ দেখা যায়। ইটালির রাজধানী রোম যে পর্ব্বতে অবস্থিত তাহা আগ্নেয় বলিয়া রোমকে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পের উপদ্রব সহ্য করিতে হয়।

পেরে নামক ফরাসী দেশীয় এক পণ্ডিত বলেন যে সূর্য্য ও চন্দ্র পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইলে ভূমিকম্প হইয়া থাকে। সার জন হার্শেল সে সম্বন্ধে বলেন—"সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রভাব ভূমিকে যদিও কাঁপাইতে পারে না, কিন্তু কাঁপাইবার চেষ্টা পায় এবং ভূমি যদি তরল পদার্থ হইত তবে কাঁপাইতে পারিত। তবে, তাহারা নিকটবর্ত্তী হইয়া ভূপৃষ্ঠকে কখন বা টানে কখন বা সঙ্কুচিত করে।

ভারতবর্ষ ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল স্থান ব্যাপিয়া ভূমিকম্প হয় তাহার এক মানচিত্র প্রকাশ করা গেল; তন্মধ্যে যে স্থানগুলি অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ সেখানে ভূমিকম্পের

প্রাবল্য, যেস্থান অল্প কৃষ্ণবর্ণ সেস্থানে ততটা প্রাবল্য নাই, যে যে স্থান শুভ্র সেখানে ভূমিকম্পের উপদ্রব নাই। মানচিত্রে দেখা যাইতেছে যে এসিয়ার তুরস্ক হইতে—ককেশশ ও হিমালয় পর্ব্বত হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণবর্ণের একটি বেড় (Belt) অঙ্কিত রহিয়াছে, এই বেড়মধ্যস্থিত স্থানে ভূমিকম্পের প্রাবল্য। এই বেড়মধ্যস্থিত নানা স্থানে অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি আছে। ককেশশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী "বাকু" নামক দেশের চতুর্দ্দিকে যে ভূমি আছে তাহাকে "অগ্নিক্ষেত্র" বলে, কারণ সেখানে ভূমির মধ্য হইতে সর্ব্বদাই আগ্নেয় বাষ্প উঠিতেছে। আসিয়ার তুরস্কের বেড়মধ্যস্থিত স্থানে সময়ে সময়ে এত ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে যে সেখানে অট্টালিকা দূরে থাক—একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত দৃষ্টি-গোচর হয় না; সেই হেতু গ্রীকেরা তাহাদিগকে "দগ্ধ রাজ্য" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। হিমালয়ে সম্প্রতি যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—সেই ভূমিকম্পের স্রোত উক্ত বেড় দিয়া পূর্ব্বে দার্জিলিং হইয়া দক্ষিণে বঙ্গদেশে আসিয়াছিল। বঙ্গের উত্তরে হিমালয় হইয়া ভূমিকম্পের বেড় এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। বঙ্গের দক্ষিণে দেখ,—বঙ্গোপসাগরের গর্ভে যে সকল দ্বীপ আছে তাহাদের মধ্যেও অনেকগুলি আগ্নেয়গিরি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানচিত্রের মধ্যে যে স্থানগুলিতে আগ্নেয়গিরি ও আগ্নেয় উৎপাত আছে তাহাদিগকে * এইরূপে চিহ্নিত করা গেল। কথিত আছে যে বঙ্গোপসাগরের মধ্যস্থ যাবা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপে ৩৮টী আগ্নেয়গিরি আছে, সেইহেতু যাবাদ্বীপে সময়ে সময়ে গুরুতর ভূমিকম্প হইয়া থাকে। যাবার উত্তরে সুমাত্রাদ্বীপে, সুমাত্রার উত্তরপশ্চিম ব্যারণ দ্বীপ পুঞ্জে এবং তাহাদের উত্তরে ও চট্টগ্রামের দক্ষিণে রামরী দ্বীপে সেই আগ্নেয় উৎপাতের গতি ধাবিত হইয়াছে। রামরী দ্বীপে যে আগ্নেয়গিরি আছে তাহা হইতে প্রায় সর্ব্বদাই অগ্নি ও বাষ্প নির্গত হইতেছে (১ম চিত্র)। চট্টগ্রাম এই দ্বীপের নিকটে অবস্থিত বলিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে তথায় এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে যে সকল ভূমিকম্প হইয়াছে, ইতিহাসে তাহাদিগের বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভারতবর্ষের দুইটি ভয়ানক ভূমিকম্পের কথা লিখিত আছে;—একটি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামে, অপরটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কচ্ছদ্বীপে হইয়াছিল। চট্টগ্রামে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে সেখানকার ভূমি ফাটিয়া গিয়া জল ও গন্ধকযুক্ত কর্দ্দমে পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল নগর দমিয়া গিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল সমুদ্র তাহাদের উপর আসিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। সেস্-লাং-টুম্ নামক পর্ব্বত ভূমি মধ্যে প্রবেশ করিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। এই ভূমিকম্পে চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটি পর্ব্বতে দুইটি আগ্নেয়গিরির আবির্ভাব হয়। চট্টগ্রাম হইতে সেই ভূমিকম্পের গতি আসিয়া কলিকাতা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কচ্ছদ্বীপে যে ভূমিকম্প হয় তাহাতে তাহার রাজধানী

ভুজনগর একেবারে ভূমিসাৎ হইয়া যায়। আহমদনগরের আহমদ সুলতান নির্ম্মিত একটি বিখ্যাত মস্‌জিদ ভূমি হইতে উৎপাটিত হয়। ভুজনগরের ১৫ ক্রোশ উত্তরে দেনোদর নামক আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। সিন্ধুদেশের দক্ষিণে সিন্ধুনদের মোহানায় সিন্ধ্রি নামে যে নগর আছে তাহা সমুদ্রের জলে মগ্ন হইয়া যায়। সেই নগরের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ (২য় চিত্র) জলে ডুবিয়া যায় বটে কিন্তু ভগ্ন হয় নাই বলিয়া তাহার একটিমাত্র চূড়া সমুদ্রের জলের মধ্যে ভাসিতেছিল (৩য় চিত্র), এই চূড়ার উপর যে কয়েকটি লোক উঠিয়াছিল তাহারাই রক্ষা পাইল। এই ঘটনার ২০ বৎসর পরে কাপ্তেন গ্রান্ট সমুদ্রের মধ্যে এই চূড়া ভাসিতে দেখিয়াছেন। এই ভূমিকম্পের গতি কচ্ছদ্বীপ হইতে নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ড, কলিকাতা ও পণ্ডিচেরী পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগে অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীর ও বঙ্গদেশ ভূমিকম্পের যে ভীষণ উৎপাত সহ্য করিয়াছে, ইতিহাসে বোধ হয় তাহার উল্লেখ থাকিবে। একদিন নহে, দুইদিন নহে, উপর্য্যুপরি কয়েকদিন ধরিয়া এই দুই স্থানে ক্রমাগত ভূমিকম্প হইয়াছে। ভূমিকম্পের প্রলয় কাণ্ড—চক্ষে যাহা দেখিলাম, কর্ণে যাহা শুনিলাম, তাহা আমাদের জীবনে আর কখনও হয় নাই।

কাল মৃগয়া।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বন।

বনদেবীগণ।

রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

১ ম। সমুখেতে বহিছে তটিনী,
দুটী তারা আকাশে ফুটিয়া
২ য়। বায়ু বহে পরিমল লুটিয়া।
৩ য়। সাঁঝের অধর হতে
ম্লান হাসি পড়িছে টুটিয়া।

৪ র্থ। দিবস বিদায় চাহে,
সরযূ বিলাপ গাহে,
সায়াহ্নেরি রাঙ্গা পায়ে
কেঁদে কেঁদে পড়িছে লুটিয়া।

সকলে। এস' সবে এস সখি
মোরা হেথা ব'সে থাকি

১ ম। আকাশের পানে চেয়ে
জলদের খেলা দেখি।—

সকলে। আঁখি পরে তারা গুলি
একে একে উঠিবে ফুটিয়া।

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

৩১৭

সকলে।— ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদুবায়,
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে চলিয়া যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,
কি জানি কিসেরি লাগি প্রাণ করে হায় হায়।

রাগিণী ছায়ানট—তাল কাওয়ালি।

১ ম। নেহার' লো সহচরি,
কানন আঁধার করি
ওই দেখ বিভাবরী আসিছে।
দিগন্ত ছাইয়া
শ্যাম মেঘরাশি থরে থরে ভাসিছে।
আয় সখি এই বেলা
মাধবী মালতী বেলা
রাশি রাশি ফুটাইয়ে কানন করি আলা;
ওই দেখ নলিনী উথলিত সরসে
অফুট মুকুল-মুখী মৃদু মৃদু হাসিছে।
আসিবে ঋষি-কুমার কুসুম চয়নে,
ফুটায়ে রাখিয়া দিব তারি তরে সযতনে,
নিচু নিচু শাখাতে ফোটে যেন ফুলগুলি,
কচি হাত বাড়াইয়ে পায় যেন কাছে।

রাগিণী মিশ্র সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

১ ২ ৩ ০

সা— —রে— —। রে— —রে—গ—। রে—গ—রে০গ০ম—। গ—রে—সা— —।

স মু খে তে ব হি ছে ত টি নী

১ ২ ৩ ০

ধা— —নি— ধা—। পা—ধা—পা—ম০গ০। রে—গ— রে০গ০ম—। গ—রে—সা—

ছু টি তা রা আ কা শে ফু টি য়া

১ ২ ৩ ০

রে০নী০। সা— —রে— —। রে— —রে—গ—। রে—গ—রে০গ০ম—। গ—

স মু খে তে ব হি ছে ত

১ ২ ৩

রে—সা— —। পা—সা—নী— —। সা— —নী০সা০রে—। সা—নি—ধা—পা—।

টি নী বা য়ু ব হে প রি ম ল

০ ১ ২ ৩

ম—গ—রে—সা০নী০। সা— —রে— —। রে— —রে—গ—। রে—গ—রে০গ০ম—।

লু টি য়া স মু খে তে ব হি ছে

০ ১ ২ ৩

গ—রে—সা— —। সা—সা—নী— —। সা— —সা০নী০রে—। সা—নি—নি—ধা—।

ত টি নী সাঁ ঝে র অ ধ র

০ ১ ২ ৩

পা—ধা০পা০ম— —। পা—ধা—সানি— ০ধা০। পা—ধা—পা—ম০গ০। রে—গ—রে০

হ তে ম্লা ন হা সি প ড়ি ছে

০ ১ ২ ৩

গ০ম—। গ—রে—সা—রে০নী০। সা— —রে— —। রে— —রে—গ—। রে—গ—রে০

টু টি য়া স মু খে তে ব হি ছে

০ ১ ২ ৩

গ০ম—। গ—রে—সা— —। পা— —পা—ম—। পা— —ধা— —। নী— —সা—রে—।

ত টি নী দি ব স বি দায়্

০ ১ ২ ৩

সানী— —সা— —। পা—সা—নী— —। সা—রে—মগ—০রে০। রে— —সা—নি—।

চা হে স র যু বি লা প

০ ১ ২ ৩

নি— —ধা০নি০সা০রে০। সা—নি—ধা—পা—। পা— —ধা— —। নী— —সা—রে—।

গা হ দি ব স বি দায়

০ ১ ২ ৩

সানী— —সা— —। পা—সা—নী— —। সা—রে—মগ—০রে০। রে— —সা—নি—।

চা হে স র যূ বি লা প

০ ১ ২ ৩
নি—ধা—পা——। পা—র্সা—নী——। র্সা——র্সা॰নী॰র্রে—। র্সা—নি—নি—ধা—।
গা হে সা য়া হ্নে রি রা ন্দা

০ ১ ২ ৩
পা—ধা॰পা॰ম——। পা—ধা—র্সানি—॰ধা॰। পা—ধা—পা—ম॰গ॰। রে—গ—রে॰
পা য়ে কেঁ দে কেঁ দে প ড়ি ছে

০ ১ ২ ৩
গ॰ম—। গ—রে—সা—র্রে॰নী॰। পা——ম——। গা——রে———। গা——পা——।
লু টি য়া এ স স বে এ স

০ ১ ২ ৩
ধা——নী——। ধা——নী——। র্সা—নী—র্রে——। র্সা—নী—র্সা—নী—।
স খি মো রা হে থা ব সে

০ ১ ২ ৩
ধা—নী॰ধা॰পা——। পা—র্সা—নী——। র্সা——র্সা॰নী॰র্রে—। র্সা—নি—নি—ধা—।
থা কি আ কা শে র পা নে

০ ১ ২ ৩
পা—ধা—পা——। ম—পা—গা——। ম——পা—ধা—। ম—পা—ম——।
চে য়ে জ ল দে র খে লা

০ ১ ২ ৩
গা——গা——। নি——নি——। ধা—নি—ধা—নি—। ধা॰নি॰র্সা—র্সানি—ধা—।
দে খি আঁ খি প রে তা রা

০ ১ ২ ৩
পা—ধা—পা——। ম——ম—গা॰ম॰। পা —পা—ম॰গ॰। রে—গ—রে॰গ॰ম—।
গু লি এ কে এ কে উ ঠি বে

০
গ—রে—সা—র্রে॰নী॰।
ফু টি য়া

রাগিণী মিশ্র কেদারা—তাল একতালা।

১ ২ ৩ ০ ১
ম——ম—পা—(ধাপাম)—পা। ধা—(সানীসা—ধা—পা—(ধাপাম)—পা——। ধা—
ফু লে ফু লে ঢ লে ঢ লে ব

২ ৩ ০ ১
(নিধাপা)—ম—ম—রে—সা—। সা॰রে॰(সারেম)—ম—ম———। সা——সা—
হে কি বা মৃ দু বায় ত টি

২ ৩ ০ ১
(সারেম)——ম—। ম—(গামপা)—পা—পা—(মপাধা)—(পামপা)—। ম—গা—গা—
নী হি ল্লো ল তু লে ক ল্লো

২ ৩ ০ ১ ২
ম—(গামধা)—(পামপা)—। ম–গা—ম—রে– –সা—। সা– –(নীসারে)—সা—নি—
লে চ লি য়া যায় পি ক কি
৩ ০ ১ ২
(ধাপাধা)—। নি– – (ধানিসা)—নি— (ধাপাধা) —পা—। সা—নি০ধা০পা — সা—
বা কু ঞ্জে কু ঞ্জে কু হু কু
৩ ০ ১ ২
নি০ধা০পা—। সা—নি০ধা০পা০ধা০পা– – –। সা—ম—ম—পা০ম০পা০ম০পা—।
হু কু হু গায় কি জা নি কি
৩ ০ ১ ২
ধা—(সানীসা)—(ধাপাধা)—পা—(ধাপাম)—পা—। ধা—(নিধাপা)—ম—ম—রে– সা–।
সে রি লা গি প্রা ণ ক রে
৩ ০
সা০রে০(সারেম)– –ম– – –।
হায় হায়

রাগিণী ছায়ানট—তাল কাওয়ালি।

১ ২ ৩ ০
রে—রে—পা—ম—। পা—পা—পা—পা০ধা০। ম—পা—ম—পা—। ম—গা—গা—
নে হা র’ লো স হ চ রি কা ন ন আঁ ধা র ক
১ ২ ৩
গা০ম০। রে– –গা—গা—। ম—ধা—পা—পা০ম০। গা—ম০গা০রে—গা০রে০।
রি ওই দে খ বি ভা ব রী আ সি
০ ১ ২ ৩
সা– – – –। পা—ধা– –পা—। ধা—ধা—ধা—নী০ধা০। পা—ধা—নী—সা০নী০।
ছে দি গন্ ত ছা ই য়া
০ ১ ২ ৩
ধা—নী০ধা০পা– –। রে– –গা–ম—। —ম—ধা—পা—। ম–গা—গা—গা০ম০।
শ্যা ম মে ঘ রা শি থ রে থ রে
০ ১ ২ ৩
রে—রে—সা– –। পা– –ধা—সা–। সা– –সা—সা—। সা—নী–ধা—পা—।
ভা সি ছে আয় স খি এই বে লা মা ধ বী মা
০ ১ ২ ৩
ধা—সা—সা—সা—। সা—রে—রে—রে—। সা—রে–সা—রে—। সা—রে—
ল তী বে লা রা শি রা শি ফু টা ই রে কা
০ ১ ২
গা—রে—। সা—নী—ধা—পা—। পা– –ধা—পা—। ধা—ধা—ধা—নী০ধা০।
ন ন ক রি আ লা ওই দে খ ন লি নী

৩ ০ ১ ২
পা—ধা—নী—র্সা০নী০। ধা—নী০ধা০পা— —। রে—রে—গা—গা—। ম—ম—
উ থ লি ত স র সে অ স্ফু ট মু কু ল
৩ ০ ১
ধা—পা—। ম—গা—গা—ম০গা০। রে — রে— সা— —। পা—ধা—ধা—র্সা—।
মূ থী মৃ দু মৃ দু হা সি ছে আ সি বে খ
২ ৩ ০ ১
র্সা—র্সা—র্সা০নী০র্সা—। নী০র্সা০র্রে—র্রে—র্রে০র্সা০। র্সা—র্সা—র্সা— —। র্সা—র্রে—
বি কু মার কু সু ম চ য় নে ফু টা
২ ৩ ০
র্রে—র্রে—। র্সা—র্রে—র্সা—র্রে—। র্সা—র্রে—র্গা—র্রে—। র্সা—নী—ধা—পা—।
য়ে রা খি য়া দি ব তা রি ত রে স য ত নে
১ ২ ৩ ০
পা—পা—ধা—পা—। ধা—ধা—ধা—নী০ধা০। পা—ধা—নী—র্সা০নী০। ধা—নী০ধা০
নী চু নী চু শা খা তে কো টে যে ন ফুল্
১ ২ ৩
পা—পা—। রে—রে—গা— —। ম—ধা—পা—পা—। ম—গা—গা—গা০ম০।
গু লি ক চি হাত্ বা ড়া ই য়ে পায়্ যে ন
০
রে— —সা— —।
কা ছে

পুরাতত্ত্বের একটি কথা।

খৃষ্টের জন্মের তিনশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অশোক রাজার রাজত্ব ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে যে সকল অনুশাসন প্রচলিত হয় ইংরাজেরা তাহা সংগ্রহ করিয়া তৎকালের অনেক বিষয় জানিতে পারিয়াছেন। গুজরাটের নিকটে গিরিনগর ও কটকের নিকটে ধৌলীগ্রামে যে দুইটি প্রস্তরে লিখিত অনুশাসন পত্র ছিল তাহা হইতে অশোক রাজার রাজত্বের সময় চিকিৎসাপ্রণালী যত্নসহকারে কি পর্য্যন্ত যে প্রচলিত হয় তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। শুদ্ধ মনুষ্যের চিকিৎসা নয় জন্তুদিগের জন্যও চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। গিরিনগরের তাম্রশাসনে যাহা লিখিত আছে তাহার অর্থ এই—

"দেবতাদিগের প্রিয় পিয়দসি রাজা কর্ত্তৃক বিজিত সর্ব্বত্রে এবং অপাপবান্ রাজাদিগের রাজ্যে, যথা—চোল, পিদ, সত্যপুতো, কেতলপুতো, তম্বপন্নি পর্য্যন্ত, অন্তিয়কো যবন রাজা ব্যাপিয়া (তাহার……রাজপ্রধান অন্তিয়কস) সর্ব্বত্র দেবপ্রিয় পিয়দসি

রাজার দুই চিকিৎসা আছে। মনুষ্য চিকিৎসা আছে, পশু চিকিৎসা আছে। মনুষ্য ও পশুদিগের উপযোগী ঔষধ আছে। যেখানে যেখানে নাই, সেখানে সর্ব্বত্র প্রস্তুত ও রোপিত থাকিবে। সকল প্রকার মূল ও সকল প্রকার ফল আছে, যেখানে যেখানে নাই সেখানে সর্ব্বত্র রক্ষিত ও রোপিত থাকিবে। মনুষ্য ও পশুদিগের উপভোগের জন্য পথে কূপ খনন করা থাকিবে এবং বৃক্ষ রোপিত থাকিবে।"

গিরিনগরের এই তাম্রশাসন পালি-ভাষায় লিখিত। পালি-ভাষা সংস্কৃত ভাষার বিকার মাত্র। কটকের নিকটস্থ ধৌলিনগরে যে তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাহাও অশোক রাজার রাজত্বকালে লিখিত হয়, তাহার সহিত গিরিনগরের তাম্রশাসনের সম্পূর্ণ মিল আছে। উপরের তাম্রশাসন হইতে এই প্রমাণ হয় যে অশোক রাজার সুশাসনে হিন্দু চিকিৎসা প্রণালি ভারতবর্ষ ছাড়িয়া আশিয়াবর্ত্তী গ্রীকদিগের অধিকৃত রাজ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

"পিয়দসি" (প্রিয়দর্শী) অশোক রাজার অপর এক নাম ছিল। অনেকে বলেন যে "চোল" "পিদ" নগরদ্বয় পুরাণের "চুলিকা" নগর হইবে, কিন্তু তাহারা ভারতবর্ষের কোথায় যে অবস্থিত ছিল তাহা স্থির হয় নাই। "সত্যপুতো" নগরের কোন মীমাংসা হয় নাই। "কেতলপুতো" নগরকে অনেকে কেটোরপুরী বা থানেশ্বর বলিয়া অনুমান করেন। "তম্বপন্নি" সিংহল দ্বীপের অন্য এক নাম, তথাকার লোকেরা সিংহলকে "তাম্রপাণি" বলে। "অন্তিয়কস" নামে যে যবন রাজার উল্লেখ আছে তিনি অশোক রাজার রাজ্য লাভের ছয় বৎসর পূর্ব্বে আসিয়াস্থিত গ্রীক রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। সেই রাজার নাম Antiochus, তাহা হইতে "অন্তিয়কস" হইয়াছে। তিনি অশোক রাজার মিত্র ছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অশোক রাজার দয়াদাক্ষিণ্যের কথা চিরপ্রসিদ্ধ। ফলমূলজনিত ঔষধ সে সময় ব্যবহৃত হইত, এবং তিনি তাহা নিজব্যয়ে কি মনুষ্য কি পশু সকলকে যে বিতরণ করিতেন—উক্ত তাম্রশাসন তাহার পরিচয় দিতেছে।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে পর্য্যন্ত পশুদিগের চিকিৎসার জন্য সুরাট নগরে যে একটি হাঁসপাতাল অবস্থিত ছিল—অনেক ভ্রমণকারী তাহা দেখিয়াছেন। কথিত আছে যে তাহা বহুকাল পূর্ব্বে ধর্ম্মনিষ্ঠ অশোক রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই হাঁসপাতালের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "অনেকখানি ভূমি অধিকার করিয়া এই হাঁসপাতাল অবস্থিত ছিল, তাহার চতুর্দ্দিক বৃহৎ প্রাচীরে বেষ্টিত, এবং পশুদিগের সুবিধামত তাহা ভিন্ন ভিন্ন মহলে বিভক্ত ছিল। রোগে আক্রান্ত হইলে তাহারা এখানে অতিশয় যত্নের সহিত রক্ষিত হইত এবং বৃদ্ধ পশুরা এখানে শান্তি উপভোগ করিত। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে এখানে রুগ্ন ঘোড়া, গর্দ্দভ, ভেড়া, মহিষ, ছাগ, বানর, নানাবিধ পক্ষি, এবং ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ একটি কচ্ছপ পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছিল।

ইন্দুর ছারপোকা প্রভৃতি ঘৃণিত কীটদিগের জন্য একটি অদ্ভুত মহল নির্ম্মিত ছিল, সেখানে তাহাদের উপযোগী খাদ্য দেওয়া হইত।"

জৈনদের কর্তৃক নির্ম্মিত "পিঁজ্‌রাপোল্" নামক পশু চিকিৎসালয় বোম্বাইয়ে আছে, তাহার বিবরণ, বোধ করি, অনেক পাঠক শুনিয়া থাকিবেন।

হেঁয়ালি নাট্য।

প্রথম দৃশ্য।

(চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছেন।)

মা। অত ভেবোনা। মাথার ব্যামো হবে বাছা!

নর। আচ্ছা, মা, "বাছা" শব্দের ধাতু কি বল দেখি!

মা। কি জানি বাপু!

নর। "বৎস।" আজ তুমি বল্‌চ "বাছা"—দুহাজার বৎসর আগে বল্‌ত বৎস—এই কথাটা একবার ভাল করে ভেবে দেখ দেখি মা! কথাটা বড় সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাব্‌বে ততই ভাবনার শেষ হইবে না।

(পুনরায় চিন্তায় মগ্ন।)

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনায় দরকার কি বাপ! ভাবনা ত তোর চিরকাল থাক্‌বে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার একবার ওঠ।

নর। (চমকিয়া) কি বল্লে মা? লক্ষ্মী? কি আশ্চর্য্য! এককালে লক্ষ্মী বল্‌তে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বল্‌ত, কাল-ক্রমে দেখ পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্চে। একবার ভেবে দেখ মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্ত্তন হয়! ভাব্‌লে আশ্চর্য্য হতে হবে।

(ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব।)

মা। আমার কি আর কোন ভাবনা নেই নরু? আচ্ছা, তুইত এত ভাবিস্ তুইই বল্ দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভাল? সকল ভাবনারই ত সময় আছে।

নর। এ কথাটা বড় গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে—ভেবে পরে বল্‌ব।

মা। আমি যে কথাই বলি তোর ভাবনা তা'তে কেবল বেড়েই ওঠে কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর কাউকে পাঠিয়ে দিই।

মাসী মা।

মাসি। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি—সমুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নর। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্য্যগৌরবের শ্মশান ক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর রোমাঞ্চিত হয় না! অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না! আহা, কতকথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বল কি মাসী! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বল না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র!

(অশ্রু নিপাত।)

মাসি। ওমা, এ যে কাঁদ্‌তে বস্‌ল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়! কাজ নেই বাপু!

(প্রস্থান।)

দিদি মা।

দিদি মা। ও নরু, সূর্য্য যে অস্ত যায়!

নর। ছি দিদিমা সূর্য্য ত অস্ত যায় না। পৃথিবীই উল্‌টে যায়। রোস আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্চি। (চারি দিকে চাহিয়া) এক্‌টা গোল জিনিষ কোথাও নেই?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে—মুণ্ডু আছে।

নর। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরচে! নাও, আর তোমার বোঝাতে হবে না, এ দিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করচে।

নর। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্টো কথা বল্‌লে মাছি ত ভন্ ভন্ করে না! মাছির ডানা থেকেই এই রকম শব্দ হয়। রোস, আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্চি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ করে।

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙ্গাইবার উদ্দেশে নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ।)

মা। (শিশুর প্রতি) বাছা, তোমার মামাকে দণ্ডবাত কর।

নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিও না। একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না—দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেচ মা? কেন না দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগ্নেকে এখন একটু আদর কর।

নর। আদর করব? আচ্ছা এস আদর করি। (শিশুকে কোলে লইয়া) কি ক'রে আদর আরম্ভ করি? রোস একটু ভাবি।

(চিন্তা মগ্ন।)

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নর। ভাবতে হবে না মা? বল কি? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান? ছেলে বেলাকার এক একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধ'রে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়—তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়! এইটে একবার ভেবে দেখ দেখি মা।

মা। থাক্‌ বাবা, সে কথা আরেকটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাইটির সঙ্গে ছুটো কথা কও দেখি!

নর। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা ছুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কি বল দেখি!

হরি। আমি চমা কাব।

মা। দেখ দেখি বাছা, ওকে এসব কথা জিগেস কর কেন? ও কি জানে!

নর। না, ওকে এইবেলা থেকে এই রকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

(নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন।)

মা। (কাতর হইয়া) বাবা, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

কর। তা যাওনা মা, তোমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে এটাতে বড় বেশী ভাবতে হল না! (প্রকাশ্যে) তাহলে ত আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নর। সত্যি না কি, তা হলে আমাকে আর কিছু দিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না—আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই!

নব্য ভারতের মানচিত্র।

ভারতের মানচিত্র একবার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখ দেখি—সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে এখনকার প্রকৃত চিত্র দেখিতে পাইবে এবং ভারতের গর্ভে ভারতের ভবিষ্যৎ কিরূপে অল্পে অল্পে গঠিত হইতেছে তাহারও আভাস পাইবে!

ভারতের সে দেবাকৃতি এখন আর নাই—সে তপ যপ ধ্যান ধারণা ধর্ম্ম কর্ম্ম, আধ্যাত্মিক ভাব এখন কোথায়? এখন ভারত পশু আকারে পরিণত—ধর্ম্ম বলের স্থানে পাশব বলের আধিপত্য দেখা যাইতেছে। পশুরাজ সিংহ ভারতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছে।

এক পারে সিংহ আর পারে রুষ্ট ভল্লুক মধ্যে বৃহৎ একটা কণ্টক বৃক্ষ। কণ্টক বৃক্ষের অন্তরাল হইতে ঋক্ষ মহাশয়কে দেখিতে পাইয়া সিংহরাজ হিমালয় রূপ জটা ফুলাইয়া পঞ্জাব-চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া, সচকিত সিমলা-কর্ণ-খাড়া করিয়া সিন্ধু নাসারন্ধ্র ফোঁস্ ফোঁস্ করিয়া বিকট গর্জ্জন করিতেছেন। অপরদিকে ধূর্ত্ত রুষ্ট ভল্লুক গুড়ি গুড়ি এক এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া একটা পঞ্জার (Panjdeh) থাবা মারিয়াছে।

স্থানাভাব প্রযুক্ত সিংহের সমস্ত শরীরটা আঁকিতে পারা যায় নাই। স্থান থাকিলে আমরা দেখাইতে পারিতাম সিংহের লেজ আসাম পর্য্যন্ত লম্বমান, সিংহের বড় দুঃখ এই লেজটি ভাল করিয়া আস্ফালন করিতে পারিতেছেন না। এক একবার ইচ্ছা হইতেছে বরাবর চীনের গা ঘেঁসিয়া লেজটি আরামে উত্তোলন করেন। কিন্তু ওদিকে আবার সিংহের মামা ভোম্বলদাসগণ আছেন। কাজেই তাহা হইয়া উঠে না।

সিংহ শরীরের অভ্যন্তরে যে চিত্রের আভাষ দেখা যাইতেছে উহার অর্থ কি?

উহা ভারতের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট পুরুষ। যে বঙ্গদেশ সিংহের পাকস্থলীর মধ্যে (কারণ বাঙ্গলাকে সিংহ যতটা হজম করিয়া ফেলিয়াছে এমন আর কাহাকেও না) সেই বঙ্গদেশেই অদৃষ্ট পুরুষের মস্তক দেখা যাইতেছে। জিহ্বা শস্ত্রী বাক্‌সর্ব্বস্ব বাঙ্গালীর বুদ্ধি ঐ মস্তকে জাজ্বল্যমান। উত্তর পশ্চিমে অদৃষ্ট পুরুষের বাহু কেন প্রসারিত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। বোম্বাই মাদ্রাজে অদৃষ্ট পুরুষের পদদ্বয় কেন প্রসারিত তাহা কি বলিতে হইবে? গতিবিধি বাণিজ্যের প্রাণ—সুতরাং পদদ্বারা বাণিজ্য সূচিত হইতেছে।

আফগানিস্থান
পঞ্জাব
দিল্লী
কলিকাতা
মাদ্রাজ
ব্রহ্মদেশ
নব্য ভারতের
মানচিত্র।

চিত্রটি ভাল করিয়া দেখ, দেখিবে উহার রেখা সকল বিচ্ছিন্ন ভাবে আছে। যে দিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সমস্ত অংশ পরস্পর সংলগ্ন হইবে—মস্তকের সহিত বাহু ও চরণ যোড়া লাগিবে—সমস্ত মিলিয়া একটি সমগ্র শরীর গঠিত হইবে সে দিন কি শুভ দিন!

আকুল আহ্বান।

অভিমান ক'রে কোথায় গেলি,
  আয় মা ফিরে, আয় মা ফিরে আয়!
দিন রাত কেঁদে কেঁদে ডাকি
  আয় মা ফিরে, আয় মা, ফিরে আয়!
সন্ধে হল, গৃহ অন্ধকার,
  মাগো, হেথায় প্রদীপ জ্বলেনা!
একে একে সবাই ঘরে এল,
  আমায় যে, মা, মা কেউ বলে না!
সময় হ'ল বেঁধে দেব চুল,
  পরিয়ে দেব রাঙা কাপড় খানি।
সাঁজের তারা সাঁজের গগনে—
  কোথায় গেল, রাণী আমার রাণী!

(ওমা) রাত হ'ল, আঁধার করে আসে
  ঘরে ঘরে প্রদীপ নিবে যায়।
আমার ঘরে ঘুম নেইক শুধু—
  শূন্য শেজ শূন্যপানে চায়।
কোথায় দুটি নয়ন ঘুমে ভরা,
(সেই) নেতিয়ে-পড়া ঘুমিয়ে-পড়া মেয়ে!
  শ্রান্ত দেহ ঢুলে ঢুলে পড়ে
(তবু) মায়ের তরে আছে বুঝি চেয়ে!

আঁধার রাতে চলে গেলি তুই,
  আঁধার রাতে চুপি চুপি আয়।

কেউ ত তোরে দেখ্‌তে পাবে না,
তারা শুধু তারার পানে চায়।
পথে কোথাও জন প্রাণী নেই,
ঘরে ঘরে সবাই ঘুমিয়ে আছে।
মা তোর শুধু একলা দ্বারে বসে,
চুপি চুপি আয় মা মায়ের কাছে।
আমি তোরে লুকিয়ে রেখে দেব,
রেখে দেব বুকের মধ্যে কোরে—
থাক্ মা সে তার পাষাণ হৃদি নিয়ে
অনাদর যে করেছে তোরে।
মলিন্ মুখে গেলি তাদের কাছে,
তবু তারা নিলেনা মা কোলে?
বড় বড় আঁখি দুখানি
রৈলি তাদের মুখের পানে তুলে?
এ জগৎ কঠিন—কঠিন—
কঠিন, শুধু মায়ের প্রাণ ছাড়া,
সেইখানে তুই আয় মা ফিরে আয়,
এত ডাকি দিবিনে কি সাড়া?

হে ধরণী, জীবের জননী,
শুনেছি যে মা তোমায় বলে!
তবে কেন তোর কোলে সবে
কেঁদে আসে কেঁদে যায় চ'লে!
তবে কেন তোর কোলে এসে
সন্তানের মেটে না পিপাসা!
কেন চায়—কেন কাঁদে সবে,
কেন কেঁদে পায়না ভালবাসা!
কেন হেথা পাষাণ পরাণ!
কেন সবে নীরস নিষ্ঠুর!
কেঁদে কেঁদে দুয়ারে যে আসে
কেন তারে করে দেয় দূর!

কেঁদে যে জন ফিরে চলে যায়,
তার তরে কাঁদিস্‌নে কেহ,
এই কি মা, জননীর প্রাণ,
এই কি মা জননীর স্নেহ!

ফুলের দিনে সে যে চলে গেল,
ফুল-ফোটা সে দেখে গেল না,
ফুলে ফুলে ভরে গেল বন
একটি সে ত পরতে পেল না।
ফুল ফোটে, ফুল ঝ'রে যায়—
ফুল নিয়ে আর সবাই পরে,
ফিরে এসে সে যদি দাঁড়ায়,
একটিও রবে না তার তরে!
তার তরে মা কেবল আছে,
আছে শুধু জননীর স্নেহ,
আছে শুধু মা'র অশ্রুজল,
কিছু নাই—নাই আর কেহ!
খেল্‌ত যারা তারা খেল্‌তে গেছে,
হাস্‌ত যারা তারা আজো হাসে,
তার তার কেহ ব'সে নেই
মা শুধু রয়েছে তারি আশে!
হায়, বিধি, এ কি ব্যর্থ হবে!
ব্যর্থ হবে মার ভালবাসা!
কত জনের কত আশা পূরে,
ব্যর্থ হবে মার প্রাণের আশা!

বড় লোকের মা।

যখন সর উইলিয়ম জোন্সের তিন বৎসর বয়স তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যু হইলে লেখা পড়া শিখাইবার ভার সমস্তই তাঁহার মাতার উপর পড়িল।

সর উইলিয়ম জোন্সের পিতা নিজ পত্নীর চরিত্র এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—"তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন, তাঁহার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তিনি দাতা ছিলেন অথচ অপব্যয়ী ছিলেন না—মিতব্যয়ী ছিলেন অথচ ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না—প্রফুল্ল ছিলেন অথচ ঘোর আমুদে ছিলেন না। চাপা ছিলেন অথচ হাঁড়িমুখো গম্ভীর ছিলেন না—সুকৌশলী ছিলেন অথচ দাম্ভিক ছিলেন না—তাঁর তেজ ছিল অথচ তিনি ক্রোধান্ধ ছিলেন না—তিনি বন্ধুর বিশ্বস্ত ও পিতামাতার আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং তিনি পতিপ্রাণা সতী ছিলেন।" স্বভাবত তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল এবং স্বামীর সহিত বাক্যালাপে ও তাঁহার শিক্ষাধীনে তাহার আরও উৎকর্ষ হইয়াছিল। পতির শিক্ষাধীনে তিনি বীজগণিতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার একটি ভাগিনেয় নাবিকবৃত্তি অবলম্বন করিবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায়—তাহার শিক্ষার ভার নিজে লইবেন স্থির করিয়া ত্রিকোণমিতি ও নৌচালন বিদ্যা ভাল করিয়া শিক্ষা করিলেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধু ম্যাক্লেস্‌ফীল্‌ডের কৌন্টেস্ নিজ প্রাসাদে থাকিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন কিন্তু জোন্সের মাতা পাছে পুত্রের লেখাপড়ার ব্যাঘাত হয় এই জন্য সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না।

শিক্ষাদিবার প্রণালী এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন যে কঠোর রূপে শাসন না করিয়া অজ্ঞাতসারে ও বিনা আয়াসে তাঁহার পুত্রের মনে জ্ঞান প্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। সর উইলিয়ম জোন্স কথায় কথায় তাঁহার মাতাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেন—তাহার উত্তরে তাঁহার মাতা বলিতেন—"পড় তাহা হইলেই জানিতে পারিবে।"

এই প্রণালীক্রমে পুত্রের জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল এবং মাতাও যত্ন সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৪ বৎসর বয়সের সময় সর উইলিয়ম জোন্স যে-কোন ইংরাজি পুস্তক সুস্পষ্ট উচ্চারণের সহিত দ্রুতরূপে পাঠ করিতে পারিতেন। তাঁহার স্মরণশক্তি পুষ্ট করিবার জন্য তাঁহার মাতা তাঁহাকে সেক্‌স্‌পিয়র হইতে বক্তৃতা ও গে বিরচিত কথা-সকল মুখস্থ করাইতেন। এইরূপে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিসকল পরিচালন প্রযুক্ত বলিষ্ঠ হইতে লাগিল। যখন ইস্কুলের ছুটি হইত তখনও তাঁহার মাতা যত্ন সহকারে অবিশ্রান্ত মাতৃ-ভাষায় শিক্ষা দিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে ছবি আঁকাও শিখাইয়াছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্স যে মহা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, সে যেমন তাঁহার নিজের বুদ্ধির প্রভাবে, তেমনি তাঁহার মাতারও অধ্যাপনা গুণে।

ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক ও মন্ত্রী গিজোর মাতা আর একটি দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার দুইটি পুত্র। বড় পুত্রটির বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তিনি বিধবা হন। তাঁহার স্বামীর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি কঠোর বৈধব্য ব্রত অবলম্বন করিয়া বিপদ সঙ্কুল জীবনের পথে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব প্রতিবেশীগণও তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাঁহার প্রতি যত্ন ও মমতা প্রকাশ করিত—